মোসলেম জগৎ

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

১৯৪৯

ইউ. এন. ধর এণ্ড কোং
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

মূল্য এক টাকা

—প্রকাশক—

শ্রীউপেন্দ্রনাথ ধর

ইউ. এন্. ধর এণ্ড কোং

১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

—মুদ্রাকর—

শ্রীত্রিদিবেশ বসু, বি. এ.

কে. পি. বসু প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১১, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা।

—ইহাতে আছে—

❋গ্রন্থকারের আরও কয়েকখানি বই❋

মোসলেম জাতির কর্ম্মবীর

জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা কথা

নূতন যুগের নূতন মানুষ

শেক্‌স্‌পীয়ারের ট্র্যাজেডী

শেক্‌স্‌পীয়ারের কমেডী

রুশ জাতির কর্ম্মবীর

ডন্ কুয়িকজোট্

লা মিজারেব্‌ল্

যুগে যুগে

মজার গল্প

মিসরের নব জাগরণ

স্বপ্ন-কথা

অতীত জগতের গৌরবের কাহিনী পড়িতে পড়িতে কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম।

মাথার শিয়রে তখন প্রদীপ জ্বলিতেছিল; বাতায়নের পথ দিয়া উর্দ্ধ আকাশে শুধু দেখা যাইতেছিল, নীল-অঙ্গণে পঞ্চমীর ক্ষীণ চাঁদের সলিতা জ্বলিতেছে।

তাহারই মাঝে আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম।

কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম বলিতে পারি না—স্বপ্নে যেখানে জাগিয়া উঠিলাম, সেখানে আর কখনও আসি নাই; অথচ সে স্থান যে একেবারে অপরিচিত, তাহাও মনে হইল না।

সেখানকার আকাশ গভীর নীল; সেখানকার প্রকৃতি তেজস্বিনী তাপস-রমণীর মত মহিমময়ী; পৃথিবী সেখানে তাহার গৈরিক বসন বিছাইয়া পড়িয়া আছে—শুধু অঞ্চলে বাঁধা গুটী-কতক নীলকান্ত-মণি!

সূর্য্যকিরণে চক্ষু ঝলসিয়া যাইতেছিল। সুদূর দিগন্তরেখার দিকে যত দূর চাই, শুধু বর্ণ-বৈচিত্র্যহীন বালুকণা স্তরে স্তরে, ধীরে ধীরে, যেন আকাশের অঙ্গ স্পর্শ করিতে চলিয়াছে।

কোথায় আসিয়াছি—কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া বিহ্বলের মত দাঁড়াইয়া আছি। এমন সময় দূরে খর্জ্জুর-বীথিকার অন্তরালে এক তরণীর অগ্রভাগ দেখা গেল!

সচকিত হইয়া উঠিতেই তরণীখানি অদৃশ্য হইয়া গেল,—তৎপরিবর্ত্তে এক অপরূপ মাতৃ-রূপ!

অঙ্গে সুনীল বসন যেন তরল নীল-জল ;—মুখে অপরূপ বিষাদের চিহ্ন! যেন সহস্র পুত্রের মাতা পুত্রহীন হইয়াছে—; চোখের দিকে চাহিয়া দেখিতেই ভীত হইয়া উঠিলাম। সম্মুখে যে মরুভূমি দেখিতেছিলাম—সেই রহস্য-ময়ীর চক্ষুর দিকে চাহিতেই দেখি, সেই দিগন্তপ্রসারী তপ্ত মরুভূ!

ভীত-সন্ত্রস্ত-পদে সেই মূর্ত্তির দিকে আগাইয়া চলিলাম। পাষাণে খোদিত মূর্ত্তির মত সে নারী দাঁড়াইয়া রহিল। কি বলিয়া সম্বোধন করিব, ঠিক করিতে না পারিয়া শুধু বিস্মিতের মত জিজ্ঞাসা করিলাম—

"কে তুমি ?"

সে রমণী ঈষৎ হাসিয়া উঠিল—তারপর ধীরে ধীরে অঙ্গুলী-ইঙ্গিত করিয়া অদূরে প্রবাহিত তটিনীর দিকে চাহিল। তারপর ধীরে কহিল—

"নীল-নদের নাম শুনেছ ?"

দ্রুত উত্তর দিলাম—"নিশ্চয়ই! কতদিন ইতিহাসের নীরস পাতার অন্তরালে অতীব-গৌরব-বাহিনী নীল-নদের অপরূপ মূর্ত্তি জেগে উঠেছে—"

আবেগের উপর আরও কত কি বলিতে যাইতেছিলাম—বাধা দিয়া রমণী বলিয়া উঠিল—

"সে নদী আমারই চোখের জল!"

"কে তুমি?"

রমণী চঞ্চল হইয়া উঠিল। কি যেন বলিতে যাইতেছিল—রুদ্ধ আবেগে বলিতে পারিল না। শুধু দূরের দিকে অঙ্গুলী-সঙ্কেত করিয়া বলিল—"কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছ?"

বিস্মিতের মত বলিলাম—"না। শুধু মরুভূর তপ্তবালুকার রূপ দেখ্‌ছি।"

"ভাল করে চাও—"

হাত দিয়া চোখ রগ্‌ড়াইয়া চাহিতেই দেখিতে পাইলাম, মরুভূমি এক অপরূপ রূপ লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। মায়া-কাননের সরোবরের মত নদীর শান্ত-প্রবাহ জলে শ্বেত মরালের দল ভাসিতেছে—তাহারই পশ্চাতে দেখি পৃথিবীর সমস্ত ব্যথিত প্রশ্ন যেন প্রস্তরীভূত হইয়া আকাশের দিকে মাথা তুলিয়াছে।

রমণী বলিয়া উঠিল—"ঐ গিজার পিরামিড। ওকে জিজ্ঞাসা কর, আমি কে? আমার শৈশবের স্মৃতি ঐ কবরের মধ্যে লুকান আছে।" বলিয়াই রমণী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। "সে বহু শতাব্দী আগেকার কথা—তখনও পৃথিবীর অন্য দিকে

কোনও সাড়া-শব্দ জাগেনি—ওরা জেগেছিল—শিশুর মন নিয়ে— ; বহু বর্ষ ধরে তারা রাজত্ব করেছিল—বংশের পর বংশ— ; তারপর ঐ কবর তারা স্বহস্তে রচনা করে আপনারা তারই মধ্যে ঢুক্‌ল। যে শক্তি তাদের ঐশ্বর্য্য এনে দিয়েছিল—সেই এনে দিল মোহ ; তারপর একদিন শয়তানের চালনায় এই নীল জলে তারা বিলুপ্ত হয়ে গেল—"

"কেন ?"

"একদিন শয়তানের প্রলোভনে ওদের ফেরাউন হজরৎ মুসা ও তাঁর অনুচরবর্গ বনি-ইসরাইলদের অনুসরণ কর্‌তে কর্‌তে এই নদে এসে পড়ে—তার মৃতদেহকে তারা কবরে রেখে দিয়েছে—আর পাহাড় কেটে জগতের সকলের সামনে তার পরাজয়ের নীতি-কথাকে মানবের কল্যাণের জন্য চিরকালের মত রেখে গিয়েছে—"

"তবে কি তুমি মিসর-লক্ষ্মী—?"

"তারপর একদিন আরবের মরু-প্রান্তরে এক অভিনব সুর্য্যোদয় হয়—তার রক্তরাগচ্ছটা আমার যৌবন-দীপ্ত ভালে এসে পড়ে—; সে আমার যৌবনের জাগরণ ; সেও আজ স্মৃতি-কথা—কবরের গায়েও তার গৌরবের কাহিনী লেখা—ঐ দেখ দূরে মরুভূমির তপ্ত-বুকে খলিফারা চির-নিদ্রাগত। তাদের মরণের স্মৃতি-চিহ্ন মরুভূমিকেও সুন্দর করে তুলেছে। তারা জীবনে ছিল শক্তিশালী—মরণেও তারা চির-সুন্দর! তাই তাদের কবর এত সুন্দর !"

মৃত্যুর পুণ্য-স্মৃতির দিকে বিহ্বল ভাবে চাহিয়াছিলাম—কতক্ষণ জানি না। মনে মনে অতীত যুগের ছবি ফুটিয়া উঠিতেছিল। যেদিন হজরতের পুণ্য-বাণীকে বহন করিয়া সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে আমর-বিন্-আস্ প্রথম খলিফারূপে মিসরে প্রবেশ করেন—সে জয়-যাত্রায় মনে হইল যেন আমিও ছিলাম। আমারও ভালে যেন ইসলামের সূর্য্যোদয়ের প্রথম রশ্মিরেখা আসিয়া পড়িয়াছিল। আপনার ধ্যানে তন্ময় হইয়া-ছিলাম ; সহসা প্রশ্নে চমক ভাঙ্গিয়া গেল .....

"তুমি তো ভারতবর্ষ থেকে আস্‌ছ? সেখানেও তারা মৃত্যুকে চিহ্নিত করে রেখেছে—তাজমহল দেখেছ তো? ভারতবর্ষের প্রকৃতির মেদুরতার দরুণ তারা মৃত্যুকে প্রেয়সীর পরিপূর্ণ প্রেমের স্বপ্ন দিয়ে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তাজমহল মৃত্যুর সেই রমণী-রূপ। কিন্তু মরুভূমির উদাসতিক্ত বায়ুতে এরা জন্মেছে—তাই এরা দেখেছে মৃত্যুর রহস্যময় কঠোর রূপ—তাই এদের পিরামিডকে দেখে মনে হয়, এ যেন মৃত্যুর পুরুষ-রূপ। ঐ দেখ—দূরে মম্‌লুক বংশের কবর-স্থান ; মিনারের চূড়াগুলো যেন জিজ্ঞাসা-চিহ্নের মত আকাশের দিকে উঠেছে।"

আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, ঘন মেঘের ছায়াপটে মিনারের মাথাগুলি সগর্ব্বে উঠিয়াছে— ; মিনারগুলির দিকে চাহিয়া মনে হইতেছিল, তাহারা যেন উন্নত-শিরে নীরবে বলিতেছে—"যে গৌরবের সমাধির ওপর আমরা উঠেছি, আমরা সে গৌরবের চিরন্তন সাক্ষী হয়ে আছি।"

অদূরে নীল নদ বহিয়া যাইতেছিল—মনে হইল তরল সময় যেন বহিয়া চলিয়াছে। কত সভ্যতা, কত অভ্য্যুত্থান, ওরই নীল জলে লেখা আছে—সহসা চাহিতেই দেখিলাম সম্মুখের নারী-মূর্ত্তি অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। কোথা হইতে তুমুল ঝড় আসিয়া সকল দিক অন্ধকার করিয়া দিয়াছে। চোখে বালি পড়িতেই চোখ বুঁজিলাম। চোখ বুঁজিয়া শুনি, কে যেন সেই ঝড়ো-হাওয়ায় কাঁদিতেছে। আকুল ক্রন্দন-ধ্বনি। পুত্রহারা জননী যেন পুত্রের জন্য কাঁদিতেছে। ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিলাম—

"কে তুমি, কে তুমি, এই মরুভূ-প্রান্তরে, এই ঝড়ের মধ্যে কাঁদ্‌ছ ?"

কেহ সাড়া দিল না, ঝড় শুধু দ্বিগুণ বিক্রমে গর্জ্জন করিয়া উঠিল। তবুও জিজ্ঞাসা করিলাম—

"কে তুমি রমণী—কেন কাঁদ্‌ছ—"

অন্ধকারে চলিতে গিয়া স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। দেখি প্রভাত-রবি বন্ধ-জানালার ভিতর দিয়া সদ্য-আসা খবরের কাগজের এক যায়গায় আসিয়া পড়িয়াছে। সেই যায়গাটুকু পড়িতে গিয়া দেখিলাম লেখা রহিয়াছে—"জগলুলের মৃত্যু-বার্ষিকী—।"

সহসা গত রাত্রের স্বপ্নের কথা স্মরণে আসিল। মরুভূমির অন্তরে সে ক্রন্দন-ধ্বনির অর্থ খুঁজিয়া পাইলাম। এবং সেই সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করিলাম, ইতিহাস পড়িয়া আর ঘুমাইতে যাইব না।

ইতিকথা

নীল-নদের দুই ধারে অতীত মিসর—স্বপ্নের মিসর—পড়িয়া আছে। নীল-নদ তেমনি বহিয়া চলিয়াছে ;—তেমনি তাহার তীরে জেলেরা পাল তুলিয়া নৌকা বাহিতেছে ;—মরুভূর পথ দিয়া ক্যারাভানের দল তেমনি চলিয়াছে ;—কিন্তু মিসরের আর সব তেমন নাই ;—মিসরের গৌরবের ধারাবাহিকতা হারাইয়া গিয়াছে।

মিসরের সভ্যতা জগতে বহু জিনিষ দিয়াছে ; সকলের অপেক্ষা মনে হয় যে, আরব-অভিযানের ফলে মিসর জগতে শিক্ষার মহিমাকে চির-উজ্জ্বল করিয়া ধরিয়াছিল। মিসর বহুকাল হইতে প্রাচ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। আল-আজহারের বিরাট হর্ম্ম্যে বসিয়া জগতের বিভিন্ন জাতির পণ্ডিতগণ বিভিন্ন কালে জ্ঞানের শিখা জ্বালাইয়া লইয়া গিয়া স্ব স্ব দেশ আলোকিত করিয়াছেন।

প্রাচীন কালের ইতিহাসে দীর্ঘকালস্থায়ী ও এতখানি সজীব বিশ্ববিদ্যালয় আর নাই। আজও মিসর সেইখান হইতে তাহার জ্ঞানের ইন্ধন সংগ্রহ করে। কিন্তু বহুজাতির উত্থান-পতন ও অত্যাচারের মধ্য দিয়া মিসরের প্রেরণার কেন্দ্রগুলি মাঝে মাঝে স্তিমিত হইয়া গিয়াছে।

মিসর বহুকাল হইতে বহুজাতির হাতে নানা প্রকারের নিগ্রহ সহ্য করিয়া আসিতেছে। শামী ও ফেরআউনী অত্যাচারের অবসান হইতে না হইতেই খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে, মিসরে আলেকজান্দার শাহের অধিনায়কত্বে গ্রীক অত্যাচার সুরু হয়। ৬৯৯ খৃষ্টাব্দে খলিফা হজরৎ ওমর ফারুকের ইঙ্গিতে সে-অত্যাচারের অবসান হয়।

খোলাফায়ে রাশেদীনের পর উমাইয়া, আব্বাছিয়া, ফাতেমিয়া ও ওছমানিয়া বংশের খলিফাগণ যথাক্রমে মিসর শাসন করিতে থাকেন। ফাতেমীয়া বংশের শাসনকালে মিসরে কাহেরা নগর দারুল-খেলাফতে পরিণত হয়।

১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে ১লা জুলাই বিশ্ব-বিজয়ী ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ানের অধিনায়কত্বে ফরাসী সৈন্য মিসরে পদার্পণ করে। এই অভিযানের ফলে মিসরের প্রাচ্যের জীবনে প্রতীচ্যের প্রথম ছাপ আসিয়া পড়ে এবং বর্ত্তমান শিক্ষিত মিসরীয়দের মধ্যেও সে প্রভাব চলিয়া আসিতেছে। মোরাদ-বেক মম্‌লুককে পরাজিত করিয়া নেপোলিয়ান তথায় ফরাসী পার্লিয়ামেণ্ট প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রসঙ্গতঃ বলা যাইতে পারে, নেপোলিয়ানও প্রভূতভাবে মিসরীয় সভ্যতার দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। কিন্তু নেপোলিয়ান-প্রতিষ্ঠিত ‘দেওয়ানী’ বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। অল্পদিন পরে মিসর আবার ওছমানিয়া সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়।

মোহাম্মদ আলী কখনও তুরস্ক-সুলতানের আনুগত্য প্রকাশ করিয়া, কখনও বিদ্রোহী হইয়া কোনও রকমে মিসরের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন। অবশেষে ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে উত্তরাধিকারগণের অযোগ্যতা ও তুর্কী সুলতানের দুর্ব্বলতার ফলে মিসরের স্বাধীনতা-সূর্য্য অস্ত যায়।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে যুগপদ্ভাবে স্মরণীয় ও শোকাবহ। এই বৎসর মোহাম্মদ আলীর প্রিয় পুত্র সঈদ পাশার মৃত্যু হয় এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ইসমাইল পাশা সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রকৃতপক্ষে এই বৎসরেই মিসরের বুকে "খঞ্জরে-হেলাল"-এর স্থলে "ইউনিয়ান জ্যাক" উড্ডীন হয়।

ইসমাইল পাশার রাজত্বে সর্ব্বপ্রথম সাক্ষাৎভাবে মিসরীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে য়ুরোপীয় শক্তিরা প্রবেশলাভ করিলেন এবং তাহার পর হইতে আর বহির্গত হইলেন না। ইসমাইল পাশাই প্রথম "খেদিব" নাম গ্রহণ করেন।

রাজ্যের বে-বন্দবস্তের জন্য ইসমাইল পাশা য়ুরোপীয় শক্তিদের নিকট হইতে প্রভূত ঋণ গ্রহণ করেন এবং তাহার পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ হইলেও তিনি ধীরে ধীরে ঋণ-দায়ে বাধ্য হইয়া একে একে বিদেশীদের হাতে নানাপ্রকারের সুবিধা তুলিয়া দিতে লাগিলেন।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ফরাসী গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে Ferdinand De Lesseps সুয়েজ-পয়োপ্রণালী-খননের অনুমতি পান। ইংরাজরা সেখানে ব্যাঙ্ক ও টেলিগ্রাফ প্রতিষ্ঠা করে।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে যখন সুয়েজ পয়োপ্রণালীর কার্য্য আরম্ভ হয়, তখন তাহাতে প্রভূত পরিমাণে মিসরের টাকা ছিল। কিন্তু আভ্যন্তরিক অর্থনৈতিক অব্যবস্থার ফলে এবং য়ুরোপের মহাজন-দের ঋণের চাপে মিসরের জীবন প্রায় শেষ হইয়া আসিতেছিল।

যে সুয়েজ পয়োপ্রণালীর অধিকার লইয়া আজ ইংরাজ পূর্ব্বের প্রবেশদ্বার আগুলাইয়া বসিয়া আছে, তাহা অংশতঃ মিসরের খেদিব স্বয়ং ইংরাজদের হাতে তুলিয়া দেন;—ঋণের চাপে মিসর গভর্ণমেণ্ট ১৭৬,৬০২ খানি সুয়েজ পয়োপ্রণালীর শেয়ার ইংরাজদের নিকট বিক্রয় করিয়া ফেলে।

১৮৭৬ সালে য়ুরোপীয় মহাজনেরা মিলিয়া Commission of Public Debt নামে এক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করিয়া মিসরের উপর পূর্ণ অধিকার বিস্তার করিল। মিসর ঋণ-দায়ে বিজড়িত হইয়া বিদেশীদের শর্ত্তমত তাহাদের হাতে মিসরের ভাগ্যলক্ষ্মীকে তুলিয়া দিল। তারপর ১৮৭৬ সাল হইতে ১৮৭৯ সাল পর্য্যন্ত ইংরাজ ও ফরাসীর দ্বৈত-শাসন পাকাপাকিরূপে মিসরের উপর প্রতিষ্ঠিত হইল।

য়ুরোপীয় জাতিরা আপনাদের কাগজে য়ুরোপীয় সভ্যতার জয়গান গাহিয়া প্রচার করিতে লাগিল যে, ইহা মিসরের পক্ষে মঙ্গলই হইল, কারণ, মিসর যে অর্থনৈতিক সঙ্কট হইতে আপনাকে উদ্ধার করিতে পারিতেছিল না—য়ুরোপের দুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান জাতি পরহিতার্থে তাহার সুসমাধান করিয়া দিয়া চলিয়া আসিবে।

কিন্তু ইতিহাসে দেখা গিয়াছে যে য়ুরোপীয় জাতিরা যেখানেই স্বার্থহীনভাবে শুধু অন্য জাতির কল্যাণসাধন করিতে গিয়াছে, সেইখানেই তাহারা রহিয়া গিয়াছে। অতিথি হইয়া ঢুকিয়া আত্মীয়ভাবে থাকিবার কায়দা য়ুরোপীয় জাতিদের খুব ভাল রকমই জানা আছে।

এই দ্বৈত-শাসনের ফলে বিদেশীদের বিচারের জন্য ভিন্ন আদালত প্রতিষ্ঠিত হইল; কর-বিভাগের উপর বিদেশীদের হাত আসিল, রেলওয়ে ও বন্দরগুলিও মিসরের জাতীয় সম্পত্তির ভাণ্ডার হইতে সর্ব্বজাতির ভাণ্ডারে চলিয়া গেল এবং সর্ব্বশেষে খেদিবের আপনার সম্পত্তিও দ্বৈত-শাসনের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িল।

মিসরের সর্ব্বশেষ অকল্যাণস্বরূপ ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে য়ুরোপীয় শক্তিদের মন্ত্রণায় মিসরের খেদিব সিংহাসনচ্যুত হইলেন এবং তৎপরিবর্ত্তে য়ুরোপীয় শক্তিরা তওফিক পাশাকে মিসরের গদিতে বসাইলেন!

মিসরের সিংহাসনের চারিপাশে যখন এইরূপ গণ্ডগোল চলিতেছিল, তখন মিসরের দরিদ্র পল্লীতে, পল্লীতে, ভগ্নগৃহে, অন্ধকার কাফিখানায়, ছাত্রদের জীর্ণ আবাসে—আর এক নূতন মিসর জাগিয়া উঠিতেছিল!

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে প্রাচ্যের নব-জাগরণের অগ্রনায়ক সৈয়দ জামালুদ্দিন আফগান তাঁহার অগ্নি-বাণী বহন করিয়া মিসরে পদার্পণ করেন। প্রাচ্যের তথা মিসরের জাগরণের সঙ্গে এই

মহাপুরুষের নাম চির-বিজড়িত। উনবিংশ শতাব্দীর প্রাচ্য-জগৎ যখন তন্দ্রায় ঘুমাইতেছিল এবং বিদেশী শক্তিরা আসিয়া নির্ব্বিবাদে তাহাদের শাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইতেছিল—তখন এই মহাপুরুষ সমস্ত প্রাচ্যভূমি পরিভ্রমণ করিয়া আপনার অগ্নি-বাণীকে প্রচার করিয়া বেড়ান।

প্রাচ্যের দ্বারদেশ-স্বরূপ মিসরের এই আত্মবিস্মৃতি ও তাহার পরিণাম চিন্তা করিয়া তিনি বিচলিত হইয়া পড়িলেন। তিনিই ঘোষণা করিয়াছিলেন—"মিসরীয়দের জন্যই মিসর। প্রতীচ্যের কোনও অংশ তাহাতে নাই।"

এই সময় মিসরের সৌভাগ্যবশতঃ একদল লোক উঠিতে-ছিল, যাঁহারা অসাধারণ চরিত্রবল ও শক্তি লইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন। মুফতি মোহাম্মদ আবদুহু, আহম্মদ আরবী প্রমুখ শক্তিশালী নেতার অধীনে সেই সমস্ত লোক জাগিয়া উঠিতেছিল।

আরবীর বক্তৃতাশক্তির অসাধারণ ক্ষমতা ছিল এবং তাহার সহিত আবদুহুর তেজ ও প্রতিভা মিশ্রিত হইয়া মিসর-যুবকের মনে নূতন আশা জাগাইয়া তুলিল। এই দুই শক্তিশালী পুরুষ জামালুদ্দিনের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন।

আরবী পাশার নেতৃত্বাধীনে মিসরে নূতন দল জাগিয়া উঠিতেছিল এবং তাহারা প্রতিদিন শক্তি সংগ্রহ করিয়া আপনাদের বাণী দেশের মধ্যে সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ছোটখাট সংঘর্ষ বাঁধিতেও লাগিল।

তওফিক কোনও মতে এই নবজাগ্রত চেতনাকে রোধ করিতে পারিতেছিলেন না। তওফিক গুরুর নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন যে, সিংহাসন লাভ করিলে মিসরকে পশ্চিমের প্রভাব হইতে মুক্ত করিবেন। কিন্তু সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তওফিক *পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হইলেন। এমন কি* গুরুর নির্ব্বাসনের ব্যবস্থা করিতেও তিনি কুণ্ঠিত হইলেন না।

জামালুদ্দিনকে বাধ্য হইয়া মিসর ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইল, কিন্তু তিনি যে ভাবের বীজ মিসরে রাখিয়া গেলেন, তাহা নানা ফলফুলে অচিরেই প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। মিসরের যুবকগণ দলে দলে মুফতি আবদুহু ও আরবী পাশার পতাকার তলে মিলিত হইতে লাগিল।

তওফিক প্রথমতঃ নেতৃ-স্থানীয় লোকদের রাজ্যের উচ্চপদ দিয়া বশীভূত করিবার আয়োজন করিলেন। আহমদ আরবীকে সেনাপতির পদে নিযুক্ত করিলেন এবং আরবীর মনোমত লোকেরাই মন্ত্রী নিযুক্ত হইল।

এই ব্যাপারে ইংরাজ শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন এবং আলেকজান্দ্রিয়ায় এই উত্থানের প্রথম সূত্রপাতের দরুণ যে হাঙ্গামা হয়, তাহার সুবিধা লইয়া ইংরাজ আলেকজান্দ্রিয়া সহর বোমার বাষ্পে ছাইয়া ফেলিল এবং এই কাজ ইংলণ্ড একাই গ্রহণ করে।

ইংরাজেরা এই ব্যাপারে সহায়তার জন্য তুর্কী ও ফরাসী গভর্ণমেণ্টকে ডাকিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা ইংরাজের প্রস্তাবে

রাজী হয় নাই। তখন লর্ড ওল্‌স্‌লীর অধীনে তেল-এল-কাবের-এর যুদ্ধে ইংরাজ বিজয়ী হইয়া মিশরে প্রবেশ করে (১৮৮২ খৃঃ অঃ)।

এদিকে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে আহম্মদ আরবীর প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হইল, কিন্তু পরে এই দণ্ড চির-নির্ব্বাসনে পরিণত হয়। এই সঙ্গে মুফতি মোহাম্মদ আবতুহুও নির্ব্বাসিত হন। নির্ব্বাসনে থাকিয়া মুফতি মোহাম্মদ আবতুহুর মানসিক অবস্থায় কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিল। কালে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি জাতির শিক্ষা-বিস্তারের দিকে নজর দিলেন।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে সুদানকে মিসরের হাতে পুনরায় তুলিয়া সতুদ্দেশে লর্ড কিচেনার মেহ্‌দী-আন্দোলন-দমনের জন্য সুদানে আসেন। সুদান তখন ইঙ্গ-মিসরীয় শাসনের অধীনে আসে এবং সেখানে সেনানায়করূপে বৃটিশ সর্দ্দার নিয়োজিত হয়।

"In order to strike terror into the hearts of the faithful followers of Medhi, this 'god-fearing' and 'chivalrous' gentleman—Kitchener caused the tomb of the Medhi to be destroyed, the body taken out of its resting place, decapituted, and the mutilated remains to be flung to the Nile".

সুদানের গণ্ডগোলের এই সূত্রপাত।

এধারে ইংরাজ জগতের বিভিন্ন জাতির নিকট এই মর্ম্মে আবেদন পাঠাইলেন যে, তাহারা মিসরের আভ্যন্তরিক গণ্ড-গোলের সুব্যবস্থা করিয়াই মিসর ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে।

কিন্তু ১৮৯০ সালে ১০ই আগষ্ট তারিখে পার্লিয়ামেণ্টে গ্লাডষ্টোন বলিয়াছিলেন—"মিসরে অনির্দ্দিষ্টভাবে থাকিয়া যাওয়া মহারাণীর শাসন-নীতির বিরুদ্ধে, এবং য়ুরোপীয় অন্যান্য শক্তির নিকট সে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছে, তাহার সত্যতা রাখিবার জন্য ইংলণ্ড অচিরেই মিসর ত্যাগ করিয়া আসিবে।"

মিসরের আভ্যন্তরিক সুব্যবস্থা করিবার জন্য ১৮৮৩ সালে লর্ড ক্রোমারকে মিসরের হাই-কমিশনার-রূপে পাঠান হয়। লর্ড ক্রোমার মিসরে আসিয়া দেখিলেন যে, ফিরিয়া যাইবার কোনও পন্থা নাই।

মিসরের রাজনৈতিক জীবনে যখন এই সমস্ত পরিবর্ত্তন চলিতেছিল, তখন মিসরের আর এক প্রান্তে জামে আজ্‌হারের একটী ছাত্রের মনে জামালুদ্দিনের অগ্নিবাণীর বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠিতেছিল।

মিসরের সভ্যতার সঙ্গে জামে আজহারের জীবন চির-বিজড়িত। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে মিসরের যে নব অভ্যুত্থান হয়, তাহারও প্রাণশক্তিরূপে ছিল জামে আজহারের ছাত্রবৃন্দ। সেইজন্য মিসরের স্বাধীনতার আন্দোলনকে এক কথায় ছাত্র-আন্দোলনও বলা যায়।

জগলুল স্বয়ং এই জামে আজহারের ছাত্র ছিলেন এবং তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনের সঙ্গেও জামে আজহারের সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন থাকে। কিশোরকালেই জগলুল আরবী পাশার পতাকার নিম্নে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন।

সেইজন্য তাঁহার ছাত্রজীবন সহসা বাধাপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু তাঁহার অন্তরে জ্ঞানের একটা তীব্র পিপাসা ছিল, এবং তাহার ফলে তিনি আপনি অধ্যয়ন করিয়া ইংরাজী, ফরাসী ও মিসরীয় ত্রিবিধ আইন-শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী হন। কিন্তু তাঁহার কোনও সনন্দ ছিল না!

আইন-ব্যবসায়ে লিপ্ত হইবার পথে তিনি বাধা পাইয়া বলিয়াছিলেন—"সনন্দ কখনও জ্ঞানের পরিমাপ হইতে পারে না—আমার আইন-জ্ঞানের পরীক্ষা দিতে আমি প্রস্তুত।"

পরীক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করা হইল। পরীক্ষকগণ তাঁহার অসাধারণ আইন-জ্ঞান দেখিয়া বিমোহিত হইলেন এবং তাঁহাকে বিনা সনন্দেই আইন-ব্যবসায়ে অধিকার দেওয়া হইল। অতি অল্পকালের মধ্যে ব্যবহারজীবী হিসাবে তাঁহার নাম মিসরের সর্ব্বত্র প্রচলিত হইয়া গেল।

১৯০৬ সালে তিনি মিসরের শিক্ষা-সচিব নিযুক্ত হন এবং এই সময় তিনি ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার পরিবর্ত্তে আরবী ভাষায় শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা প্রচলিত করেন।

১৯১০ সালে তিনি আইন-সচিবের পদে নিযুক্ত হন, কিন্তু লর্ড কিচেনারের ইঙ্গিতে তাঁহাকে ১৯১৩ সালে ঐ পদ ত্যাগ করিতে হয়।

* * *

জগলুলের রাজনৈতিক জীবনের প্রারম্ভ আরবী পাশার পতাকার নিম্নে হইলেও তিনি সেই-সময়কার মিসরীয় রাজ-

নীতিক্ষেত্রে মধ্য-পন্থী ছিলেন। তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও কর্ম্মনিষ্ঠার ফলে মধ্য-পন্থী দল ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিতেছিল এবং তাহাই ক্রমশঃ জাতীয় দলে পরিণত হয়।

লর্ড ক্রোমারের আমলে মিসর ধীরে ধীরে সকল বিষয়ে বিদেশীয়দের করতলগত হইল। খেদিবকে নামমাত্র সম্মুখে রাখিয়া রাজ্যশাসনের সকল বিভাগে ইংরাজের শাসন-হস্ত আসিয়া পড়িল।

প্রত্যেক মিসরীয় মন্ত্রীর একজন করিয়া ইংরাজ সেক্রেটারী নিযুক্ত হইল এবং মিসরের শাসনবিভাগের অন্যান্য বড় বড় পদেও ইংরাজ বাহাল হইতে লাগিল। কালক্রমে দেখা গেল, সমস্ত দেশ এক চমৎকার উপায়ে বিদেশীদের অঙ্গুলী-নির্দ্দেশে চলিতেছে।

মিসরীয় যুবকদের মনে সন্দেহ জাগিতে লাগিল। তাহারা নিজেদের দেশে বসিয়া অপরের ইঙ্গিতে চলিবে কেন? এমন সময় ১৯১৪ সালে য়ুরোপের আকাশকে আচ্ছন্ন করিয়া মহা-যুদ্ধের রক্ত-আলো জ্বলিয়া উঠিল। দেশে দেশে সাড়া পড়িয়া গেল।

এই সময় আইনতঃ মিসর তুর্কী-শাসনের অন্তর্ভুক্ত হইলেও ইংরাজ মিসরকে British Protectorate বলিয়া জগতে ঘোষণা করিল এবং তুর্কীর সহিত ষড়যন্ত্র করার অপরাধে খেদিব গদি-চ্যুত হইলেন!

ইংরাজেরা ফোয়াদ পাশাকে সিংহাসনে বসাইল এবং সমস্ত দেশ যতদিন না যুদ্ধ-বিরতি হয়, ততদিন পর্য্যন্ত সামরিক আইনের অধীনে রহিল। পার্লিয়ামেণ্ট হইতে স্পষ্টভাষায় ক্ষুব্ধ মিসরীয়দের আশার বাণী দেওয়া হইল যে, যুদ্ধবিরাম ঘটিলেই *বৃটিশ সৈন্য মিসর ত্যাগ করিয়া যাইবে এবং মিসরকে পূর্ণ* স্বাধীনতা দেওয়া যাইবে।

১৯১৮ সালে নভেম্বর মাসে যুদ্ধ-বিরতি স্বাক্ষরিত হইবার দুই দিন পরেই জগলুল তদানীন্তন মিসরের হাই-কমিশনার স্যার রেজিন্যাল্ড উইনগেটের নিকট প্রতিশ্রুতি প্রতিপালনের দাবী আনিলেন এবং তৎসঙ্গে বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্টে মিসরের বিষয় সিদ্ধান্ত করিয়া আসিবার জন্য অনুমতি চাহিলেন। কিন্তু প্রতিশ্রুতি পালন দূরে থাকুক, জগলুলকে মিসর ত্যাগ করিবার অনুমতিও দেওয়া হইল না।

এই ব্যাপারে মিসরের মধ্যে জাতীয়তার আন্দোলন সহসা অত্যন্ত ব্যাপকভাবে জাগিয়া উঠিল। রুসেদী পাশা প্রধান-মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিয়া জগলুলের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তখন সমস্ত দলাদলি ভুলিয়া মিসর জগলুলের পতাকার নিম্নে আসিয়া দাঁড়াইল—তাহাদের সকলের আদর্শ এক—মিসরের পূর্ণ স্বাধীনতা! অপরাগ হইলেও মিসর কোনও বিদেশীয়ের শাসন-পরিচালন সহ্য করিতে রাজী নহে।

সেই সময় জগলুলের ওজোস্বিনী বাণীর স্পর্শে মিসরের যুবকদের মনে এক বিরাট ভাবোন্মাদনা আসিয়াছিল—যাহার

বলে তাহারা মৃত্যুকেও তুচ্ছ করিতে শিখিয়াছিল। জগলুলের বাড়ী মিসরের জাতীয়তা-আন্দোলনের কেন্দ্র হইয়া উঠিল। তখন প্যারিসে শান্তিবৈঠকের অধিবেশন চলিতেছিল। জগলুল ঠিক করিলেন, সেইখানে গিয়া তিনি মিসরের কথা উত্থাপন করিবেন।

এধারে ইংরাজেরা মিসরের আভ্যন্তরিণ চাঞ্চল্য দেখিয়া মিসরে পুনরায় সামরিক-আইন জারী করিল। শাসন-পরিষদ ভাঙ্গিয়া গেল এবং ১৯১৯ সালের ১লা মার্চ্চ জগলুল ও তাঁহার তিনজন অন্তরঙ্গ কর্ম্মী কারারুদ্ধ হইয়া মাল্টায় নির্ব্বাসিত হইলেন। জগলুলের কারাবাসের কথা শুনিয়া সমগ্র মিসর আন্দোলিত হইয়া উঠিল। প্রকাশ্যভাবে মিসরীয় যুবকগণ ইংরাজ-শাসনের বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিল।

ক্রমশঃ অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিল এবং ১৯২০ সালের প্রারম্ভে মিসরের নানা স্থলে বিপ্লব রক্ত-মূর্ত্তি লইয়া দেখা দিল। চারিদিকের রেল-লাইন, টেলিগ্রাফ-তার, ভাঙ্গিয়া এবং ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দেওয়া হইল। কায়রোতে সৈনিকদের গাড়ী আক্রমণে বহু বৃটীশ সৈনিকের প্রাণনাশ ঘটিল।

মিসরীয় পুলিশকে বিপ্লব থামাইবার জন্য আজ্ঞা দেওয়া হয়, কিন্তু তাহারা এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে নারাজ হইয়া সরিয়া দাঁড়ায়। আর একদিক দিয়া একদল বৃটীশ সৈন্য উন্মাদ হইয়া নগরে নগরে ভয়াবহ কাণ্ড ঘটাইতে লাগিল!

রসেদী পাশার মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করার পর আর কোনও মিসরীয় তখন মন্ত্রিত্ব গঠন করিতে যাইল না। একটা তুমুল অসহযোগ আন্দোলন মিসরকে ছাইয়া ফেলিল। ছেলেরা স্কুল খালি করিয়া জাতির কাজে আত্মনিয়োগ করিল এবং স্কুলেও সামরিক আইন জারী করিয়া ছাত্রদের বশে রাখার চেষ্টা করা হইল।

ব্যাপার ভয়াবহ হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া লর্ড এলেনবী জগলুল ও তাঁহার তিনজন সঙ্গীকে কারামুক্ত করিয়া দিলেন। কারামুক্ত বীরগণকে সমগ্র মিসর সাদরে বরণ করিয়া লইল। মাল্‌টার কারাগার হইতে প্রত্যাগমনের সেই দৃশ্য-প্রসঙ্গে একজন বৃটীশ পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য লিখিয়াছিলেন—

"সেই অভ্যর্থনার বিপুল উন্মাদনা দেখিতে দেখিতে আমার মনে সহসা বাইরণ ও ব্রাউনিঙের কথা মনে পড়িল। গ্রীসে হয়ত এই রকম দৃশ্য দেখিয়া ইংরাজ কবি গাহিয়াছিলেন—'Roses, Roses, all the way, myrtle mixed in my path like mud'—পথে পথে পায়ে পায়ে গোলাপের পাপড়ি ছড়ান। সামান্য কৃষকের সহিত সম্ভ্রান্ত পাশা পর্য্যন্ত সকলেই আজ পাশাপাশি। আমার হাতে এমন কোনও কলম নাই যে, সে-দৃশ্য বর্ণনা করি। অধিকাংশ রাস্তা আগাগোড়া কার্পেট দিয়া মোড়া—মাথার উপর গৃহ-বাতায়ন হইতে অজস্র ধারে গোলাপের দল ঝরিয়া পড়িতেছে।"

ওধারে তখন টেমস নদীর ধারে পার্লিয়ামেণ্টে লর্ড কর্জন বলিতেছেন—

"The world to-day is suffering in many places at the present time from the cult of a fanatical and disruptive type of nationalism. His Majesty's Government will set their face against it as firmly in Egypt as elsewhere" অর্থাৎ "পৃথিবীর চারিদিকে আজকাল জাতীয়তার একটা কদর্য্য পাগলামী ও খামখেয়ালী ধ্বংসের রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহা দমন করিবার জন্য বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট মিসরে এবং সর্ব্বত্র আপনাদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিবেন।"

যে দেশের মনোভাব এই রকম, সেই দেশ হইতেই মিসরের ব্যাপারখানা কি এবং মিসরকে কি শর্ত্তে কতখানি স্বাধীনতা দেওয়া যাইতে পারে—তাহার তথ্যসংগ্রহের জন্য এক কমিশন প্রেরিত হইল। ইহার নাম মিলনার কমিশন। জগলুল এই কমিশনের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। কেহই যেন এই কমিশনের সম্মুখে কোনও কথা না বলেন। মিসরবাসী চায় পূর্ণ স্বাধীনতা—মিলনার কমিশন নয়।

সুতরাং মিলনার কমিশনকে মিসর সম্পূর্ণরূপে বয়কট করে। কমিশনের সময় মিসরের সাধারণ লোকদের মনের অবস্থা এতদূর উদগ্র হইয়া উঠিয়াছিল যে, যখন এক গ্রাম পরিভ্রমণ করিতে গিয়া লর্ড মিলনার একজন সামান্য ফেল্লাহ্ (কৃষক)-কে জিজ্ঞাসা করেন—"তুমি কি বুনিতেছ?" সে প্রথমে কোনও উত্তর দেয় না। বারবার জি

অবজ্ঞা-ভরে উত্তর দিল—"যাও, আমাদের নেতা জগলুল পাশাকে জিজ্ঞাসা করিয়া এস!"

১৯২১ সালে জগলুল পুনরায় কারারুদ্ধ হন, কিন্তু তাহার ফলে মিসরে জাতীয় আন্দোলন আরও রুদ্র-মূর্ত্তি ধরিয়া উঠিতে লাগিল। অবশেষে বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট মিসরের পূর্ণ স্বাধীনতা জ্ঞাপন করিয়া নূতন শাসন-পরিষদ ও শাসন-প্রণালীর ব্যবস্থা দিলেন; তবে এ শর্ত্তেও সুয়েজ পয়োপ্রণালী সংরক্ষণ এবং মিসরে বৃটীশ-সৈন্য-স্থাপনের বিষয়ে অনেক ন্যায়ের ফাঁকি রহিয়া গেল।

কারাগার হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ও তদানীন্তন রাজনৈতিক অবস্থা পরিদর্শন করিয়া জগলুল নবগঠিত শাসন-পরিষদ অধিকার করাই যুক্তিসঙ্গত মনে করিলেন। ১৯২৪ সালের নির্ব্বাচনে সদলবলে নির্ব্বাচিত হইয়া জগলুল মিসরের নব-গঠিত শাসন-প্রণালীর প্রথম প্রধানমন্ত্রী হইলেন। কিন্তু শাসন-পরিষদে প্রবেশ করিয়া জগলুল দেখিলেন যে, এই শাসন-পরিষদের ভিতরে মিসরের পূর্ণ-স্বাধীনতা দানের একটা ছল মাত্র রহিয়াছে!

সেই সময় সুদানে একটী ব্যাপারে মিসরের রাজনৈতিক আকাশ আবার ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়া উঠিতেছিল।

মিসরীয় ও বৃটীশ সৈন্যদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও মনোমালিন্য সেখানে প্রকাশ পাইতেছিল। তাহার ফলে ১৯২৪ সালের ১৯শে নভেম্বর কায়রোর রাজপথে স্যার

লি ষ্টাক গুপ্ত-ঘাতকের হস্তে নিহত হ'ন। তাহাতে লর্ড এলেনবী মিসরীয় শাসন-পরিষদের উপর এক কড়া হুকুম জারী করেন যে, মিসরীয় শাসন-পরিষদে এই হত্যার জন্য ক্ষমা চাহিতে হইবে, পাঁচ লক্ষ পাউণ্ড দিয়া এই হত্যার ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে এবং যেমন করিয়াই হউক হত্যাকারীদের দণ্ড দিতে হইবে এবং সুদান হইতে সমস্ত মিসরীয় সৈন্যকে সরাইয়া আনিতে হইবে।

জগলুল এই শর্ত্ত গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন এবং সেই সঙ্গে মন্ত্রিত্বও ত্যাগ করিলেন। সমগ্র সুদান বৃটীশ সামরিক আইনের অধীনে রহিল এবং মিসরীয় সৈন্যদের সুদান হইতে বাহির হইয়া আসিতে হইল।

বৃটীশদের পরামর্শে ফোয়াদ পাশা জিয়ার পাশাকে প্রধান-মন্ত্রী করিয়া নব-মন্ত্রিদল সংগঠন করিলেন, কিন্তু পুনর্নির্ব্বাচনের কালে জগলুল তাঁহার দল-বল লইয়া পুনরায় শাসন-পরিষদ অধিকার করিয়া লইলেন। ফোয়াদ পাশার অনুমতি লইয়া জিয়ার পাশা শাসন-পরিষদ পুনরায় ভাঙ্গিয়া দিলেন।

এই ব্যাপার লইয়া তুমুল আন্দোলন চলিল এবং তাহার ফলে পুনরায় ১৯২৬ সালের মে মাসের নির্ব্বাচনে জগলুলের দল পুনরায় শাসন-পরিষদ অধিকার করিল এবং মিসরে জগলুলের দল সর্ব্বত্রই জয়দৃপ্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। এই ব্যাপার দেখিয়া ইংরাজ-রাজনৈতিক মহলে বিশেষ চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল, এবং ইংরাজ-প্রতিনিধি লর্ড লয়েড

জগলুলকে জানাইলেন যে, তিনি কোনও মতে মিসরের প্রধান-মন্ত্রী হইতে পারিবেন না।

শুধু এই হুমকি দিয়াই ইংরাজ ক্ষান্ত হইল না—তৎক্ষণাৎ আলেকজান্দ্রিয়ায় একখানি রণপোতও পাঠান হইল, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে কায়রো শহরে বৃটীশ সৈন্যদের কুচ-কাওয়াজ দেখান হইতে লাগিল। এই সমস্ত রাজনৈতিক ইঙ্গিতের দ্বারা মিসরকে বুঝাইয়া দেওয়া হইল যে, ইংরাজের হুমকি না মানিলে ইংরাজ ছাড়িবে না।

এই হুমকির ফলে জগলুল মন্ত্রি-সভা গঠন করিবার ভার ত্যাগ করেন এবং এই জন্য তাঁহার অনুচরবর্গের মধ্যে বিশেষ অসন্তুষ্টি ফুটিয়া উঠে। অনেকে বলেন যে মিসরের সেই-সময়কার রাজনৈতিক উত্তেজনার মুখে জগলুলের এই কার্য্য মিসরের স্বাধীনতা-আন্দোলনকে অনেকখানি নিষ্প্রভ করিয়া দেয়।

মন্ত্রি-সভা গঠন করিবার ভার লিবারেল-পার্টির নেতা আদলী পাশার উপর পড়ে। কিন্তু মন্ত্রি-সভার বাহিরে থাকিয়াও জগলুলের দল প্রতিবন্ধকের মধ্য দিয়া শাসন-পরিষদে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল।

মিসরের স্বাধীনতা-জ্ঞাপন পত্রে ইংরাজ মিসরকে পূর্ণ স্বাধীনতাই দিয়াছিল, কিন্তু দেখা গেল, যখন মিসরের সৈন্য-বিভাগকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবার প্রস্তাব উঠিল, তখন স্বাধীন মিসর বাধা পাইল।

মিসরবাসী দেখিল, মিসরের হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতারূপে রহিয়াছে, মিসরের বৃটীশ হাই-কমিশনার। এই বৃটীশ হাই-কমিশনারের স্থলে একজন মিসরীয়কে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য জাতীয় দল তুমুল আন্দোলন সুরু করিল, কিন্তু বৃটীশ রাজ্যের রক্ত-আঁখি পুনরায় জ্বলিয়া উঠিল এবং মিসরের দিকে দুইখানি রণপোত সুসজ্জিত হইয়া যাত্রা করিল।

জাতির অন্তর্দ্বন্দ্বের এই সন্ধিক্ষণে সমস্ত মিসরকে অন্ধকারে রাখিয়া ১৯২৭ সালের আগষ্ট মাসে জগলুল এই মর্ত্ত্যলোক ত্যাগ করিয়া জান্নাতে মহাপ্রস্থান করিলেন! সমস্ত মিসর এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় মর্ম্মাহত হইয়া পড়িল। সামান্যতম দরিদ্র চাষা হইতে ফোয়াদ পাশা পর্য্যন্ত জগলুলের কবরে এক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

একদিন এই বাংলাতেই আর এক মহাদৃশ্য দেখিয়াছিলাম, যখন দেশবন্ধুর মৃতদেহকে সমগ্র জাতি অশ্রুজলের মধ্য দিয়া শ্রদ্ধার অঞ্জলি দিয়াছিল।

মরিবার সময় জগলুল বলিয়া যান—"একটী জগলুল মরিয়া গেল কিন্তু তাহার স্থলে সহস্র জগলুল মিসরে রহিল।"

জগলুলের মৃত্যুতে মিসরের জাতীয় দল আরও সজীব হইয়া উঠিল এবং জগলুলের আরব্ধ কার্য্যকে আরও আগ্রহ-সহকারে জড়াইয়া ধরিল।

কিন্তু ব্যক্তিত্বের অভাব কখনও কোনও দলের দ্বারা পরিপূর্ণ হয় না; তাই আজ মিসরের রাজনৈতিক উত্থান-পতন ও

মন্ত্রি-সভা ভাঙ্গা-গড়ার মধ্যে সেই ব্যক্তিত্বের একান্ত অভাব সবিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিতেছে।

মিসরের রাজনৈতিক সমস্যার একটা সুব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত এই সময় সারওয়াৎ পাশাকে সঙ্গে লইয়া ফোয়াদ পাশা বিলাত-গমন করেন এবং সেখানে যথেষ্ট সম্মান পান।

এই সারওয়াৎ পাশার মন্ত্রিত্বের সময় মিসরে প্রেস-আইন প্রবলভাবে জারী করা হয়। জাতীয় দলের বহু সংবাদ-পত্রকে জোর করিয়া স্তব্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং প্রকাশ্য সভা-সমিতিতে পুলিশের জোর-জুলুম চলিতে থাকে।

এই জন্য মিসরের মন্ত্রি-সভায় প্রকাশ্যভাবে সভা-সমিতি করিবার অধিকার দাবী করিয়া জাতীয়দলের অধিনায়ক নাহাস পাশা এক প্রস্তাব আনিলেন।

সারওয়াৎ পাশার মন্ত্রি-সভা তাহা অগ্রাহ্য করে এবং তাহার ফলে তাঁহার উপর আস্থাহীন হইয়া 'ভোট অফ সেনসার' আনা হয়।

ফলে সারওয়াৎ পাশা মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। তাঁহার স্থলে জাতীয়দলের প্রতিনিধিরূপে নাহাস পাশা মন্ত্রি-সভা গঠন করেন। নাহাস পাশার মন্ত্রি-সভায় ইহা গ্রাহ্যও হইল।

সেই সময় সহসা মিসর-রাজ ফোয়াদ পাশার অনুজ্ঞাক্রমে মিসরের মন্ত্রি-সভা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল এবং সেই সঙ্গে হুকুমজারী হইয়া গেল—তিন বৎসরের মধ্যে আর নির্ব্বাচন হইবে না। মিসরীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতাসূচক যে শর্ত্ত ছিল,

তাহাও রদ্ করা হইল। সমস্ত পূর্ব্ব-জগৎ বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া এই সংবাদ গ্রহণ করিয়াছে।

স্বাধীনতার যে সামান্য অংশটুকু আয়ত্ত করিবার জন্য লক্ষ লক্ষ মিসরীয় যুবক তিল তিল করিয়া জীবন-বিন্দু দান করিয়া আসিয়াছিল, আজ সহসা সে কি কর্পূরের মত উড়িয়া যাইবে? শহীদের লোহু দিয়া যে ভূমি শ্যামল হইয়া উঠিতেছিল, আজ কি সহসা সেখানে কাঁকর ফুটিয়া উঠিবে?

জগলুলের কবরের উপর সেদিন মিসরবাসীরা যে ফুল রাখিয়া আসিয়াছিল—তাহা এখনও শুকাইয়া যায় নাই; কিন্তু ইহারই মধ্যে মিসরের স্বাধীনতার সংগ্রামের মূর্ত্তি বদলাইয়া গেল!

যেদিন মিলনার কমিশনারের বিবরণের ফলে ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ইংরাজ মিসরের স্বাধীনতা-পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিল—সেদিন হইতে আজ পর্য্যন্ত মিসরীয়রা সে স্বাধীনতার খুব বেশী পার্থক্য বুঝিতে পারে নাই।

মিসর সেদিন নামে স্বাধীন হইয়াছিল মাত্র; মিসরের ভাগ্যের চরম বিধাতারূপে মিসরে ইংরাজ হাই-কমিশনার রহিয়া গেল এবং টেম্‌স নদীর ধার হইতে মিসরের ভাগ্য যেমনই নড়িতেছিল—সেইরূপই নড়িতে লাগিল।

সম্প্রতি নাহাস পাশার মন্ত্রিত্বের সময় জনসভা-আইন প্রতিরোধ-কল্পে ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট যে ভয়ানক মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করিয়াছিলেন—তাহাতেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে "স্বাধীন মিসর"

শুধু ব্যাঙ্গোক্তি মাত্র। এই আইনে মিসরীয়রা তাহাদের সভা-সমিতির বিষয়ে পুলিশের অযথা জোর-জুলুম অথবা সহানুভূতির মাত্রা হ্রাস করিতে চায়—স্বাধীন মিসরের এই ছিল অপরাধ।

মিসরীয় পার্লিয়ামেণ্টের "চেম্বার" সভা হইতে ইহা পাশ হইয়া "সিনেটের" অনুমোদনের অপেক্ষায় থাকে। [ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেণ্ট যেমন হাউস অফ কমন্‌স ও হাউস অফ লর্ডস দুইভাগে বিভক্ত—নব-গঠিত মিসরীয় পার্লিয়ামেণ্টও চেম্বার ও সিনেট দুইভাগে বিভক্ত।]

ইত্যবসরে হাই-কমিশনার লর্ড লয়েড অতি স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল ভাষায় জানাইয়া দিলেন যে, ঐ বিল তুলিয়া না লইলে 'স্বাধীন' মিসরে ইংরাজ যাহা সমুচিত বিবেচনা করিবেন, তাহাই করিবেন, এবং ইহা যে অসার বাক্য নয় শুধু—ছয়খানি বৃটিশ রণপোতও মাল্টা হইতে মিসরের উপকূলে আসিয়া লাগিল।

নাহাস পাশা ইংলণ্ডের এই আচরণে ক্ষুব্ধ হইয়া পত্রে জানাইলেন যে, মিসরীয় পার্লিয়ামেণ্টের দুই সভায় যে বিল পাশ হইয়া গিয়াছে, তাহার প্রতিরোধ-কল্পে তাহার অন্তরায় হওয়া ইংলণ্ডের অন্যায় হইয়াছে; সদুত্তরের আশায় নাহাস পাশা নভেম্বর মাস পর্য্যন্ত ঐ বিল মুলতুবী রাখিলেন।

নাহাস পাশা বিলাতে যে পত্র পাঠাইয়াছিলেন, তাহার উত্তরে হোয়াইট-হল হইতে যে জওয়াব আসে—তাহা স্বাধীন মিশরের পক্ষে বিন্দুমাত্র গৌরবের নয়।

এদিকে নাহাস পাশার বিল মুলতুবী রাখার বিষয় লইয়া মিসরে জাতীয় দলের মধ্যে অসন্তোষের দেখা দিল। মিসরের জাতীয় দল স্বাধীনতার নামে এই প্রকারের জঘন্য পরাধীনতা সহ্য করিতে চাহে নাই।

পরাধীন মিসর আপনার দেশে আপনার আইন প্রণয়ণ করিতে পারে না—ইহার মানে হয়; কিন্তু স্বাধীন মিসরও যখন তাহা পারে না, তখন সে স্বাধীনতার প্রহসন লইয়া জাতির কি লাভ?

শুধু একটা মিথ্যা আত্ম-সন্তুষ্টি—যাহা ক্রমশঃ মনকে ভুলাইয়া দুর্ব্বল করিয়া রাখে—সেই স্বাধীনতার কাষ্ঠ-পুত্তলি লইয়া যুবক মিসর কি খেলা খেলিতে বসিবে?

জাতীয় দলের অসন্তুষ্টি ও জন-মতের উত্তেজনার ফলে নাহাস পাশার মন্ত্রিত্ব তিরোহিত হইয়া মোহাম্মদ মাহ্মুদ পাশা নূতন করিয়া মন্ত্রি-সভা গঠন করেন। কিন্তু আঁতুড়-ঘরের চৌকাট পার হইতে না হইতেই মিসর-রাজ ফোয়াদ পাশার অনুজ্ঞায় মিসরের এই নূতন মন্ত্রি-সভা তিন বৎসরের মত ঘুমাইতে গেল!

বৃটীশ-রাজ যদি ভাবিয়া থাকেন যে এইভাবে জাতির মুখবন্ধ করা যায়—তাহা হইলে তিনি যে কতদূর ভ্রান্ত, তাহা বলা দুরূহ। এই সমস্ত অন্যায় হঠকারিতার সংঘাতে দেশের মধ্যে চেতনা আরও জাগ্রত হইয়া উঠে;—মুমূর্ষু জাতি কশাঘাত না পাইলে জীবন পায় না, ইহাই নিয়ম।

মিসরের ঘন-ঘটাচ্ছন্ন আকাশের নিম্নে জগলুলের কবরের ভিতর হইতে, মনে হয়, এক প্রশ্ন উঠিতেছে—"মিসর কোথায় চলিয়াছ, তুমি ?"

মিসরের যুবকেরাই জানে, জগলুলের আত্মার প্রশ্নের কি জবাব দিবে তারা···

নবীন পারস্য

মহাযুদ্ধের অবসানে

ধ্বংসের ভিতর দিয়াই সৃষ্টির নব নব রূপ বিকশিত হইয়া উঠিবে—বিশ্বের এই বিধান। এখানে মঙ্গল আসে অমঙ্গলের ভিতর দিয়া—কল্যাণ আসে অকল্যাণের সহস্র কণ্টক-বর্ম্ম ভেদ করিয়া।

গত মহাসমরে ধরণীর শ্যামল বসনাঞ্চল সন্তানের রক্তে রাঙা হইয়া উঠিল—দেশে দেশে জননীরা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল—পত্নীরা অসহায় শিশুর হাত ধরিয়া বিবাহের রাখী খুলিল। কিন্তু এই আর্ত্ত হাহাকারের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিল—মানবের কল্যাণকামনা। রুধিরাক্ত ধরণীর বেদনার সায়রে নূতন মানব জাগিয়া উঠিল—দেশে দেশে, দিকে দিকে।

এই অকল্যাণকর মহাযুদ্ধ অজ্ঞাতসারে মানুষের সর্ব্বোত্তম কল্যাণে লাগিয়া গেল। য়ুরোপীয় শক্তিরা এই যুদ্ধের ফলে আপনাদের অন্তরের সঙ্গে পরিচিত হইল। পশু-শক্তি আপনার

দুর্দ্দমনীয় বেগে আপনিই শ্রান্ত হইয়া পড়িয়া অন্তরের শক্তির দিকে ফিরিয়া চাহিল। আর যে সমস্ত জাতি সাক্ষাৎ ভাবে এই যুদ্ধে যোগদান করে নাই, এই যুদ্ধের ঢেউ তাহাদেরও জড়তায় ঘা দিল। বর্ত্তমান প্রাচ্য জগতের দিকে চাহিলে এ কথা খুব স্পষ্ট ভাবেই বোঝা যায়। চীনে, ভারতে নব-জাগরণ আসিয়াছে; পারস্যের বুকে আবার আগুন জ্বলিয়া উঠিতেছে।

কিন্তু য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী দশ বৎসর পারস্যের পক্ষে এক মহা সঙ্কটকাল। দেশের চারি দিকে অরাজকতা ও বিপ্লব। দুর্ভিক্ষে ও রাজস্ব-আদায়ের অব্যবস্থায় রাজকোষও শূন্য। যাহা কিছু বা কর আদায় হয়, বিলাসী অকর্ম্মণ্য শাহ্‌গণের বিলাস-ব্যসনেই তাহা খরচ হইয়া যায়।

এই সুযোগে ইংরাজ এবং রুষিয়া উভয়েই পারস্যকে গ্রাস করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতে লাগিল এবং ইংরাজ উত্তর পারস্যে এবং রুষিয়া দক্ষিণ পারস্যে আপনাদের প্রভাব বিস্তার করিতে বহু পরিমাণে সফলকামও হইল। কিন্তু পারস্যের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন। তাই ঠিক এই সময়ে য়ুরোপের দ্বারে দ্বারে প্রলয়ের ডমরুধ্বনি বাজিয়া উঠিল। মহাযুদ্ধের সেই প্রলয়ঙ্কর খেলায় মাতিয়া ইংরাজ এবং রুষিয়াকে তখনকার মত পারস্য অধিকার বাসনাকে বিসর্জ্জন দিতে হইল।

পারস্য এই যুদ্ধে যোগ দেয় নাই, তথাপি সম্মিলিত বাহিনী এবং তাহাদের শত্রুসেনা উভয় পক্ষের আক্রমণেই তাহাকে যথেষ্ট ক্ষতি ভোগ করিতে হইয়াছে!

আলী রেজা খান্ পাহ্লবী

যে মহাপুরুষের অক্লান্ত পরিশ্রমে পারস্য আজ এই নব জীবন লাভ করিয়াছে, তাহার নাম আলী রেজা খান পাহ্লবী। বর্ত্তমানে তিনিই শাহান্‌শাহ্ রেজা খান পাহ্লবী নাম-ধারণ করিয়াছেন।

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে পারস্যের মাজেন্দারাণ নামক পার্ব্বত্য প্রদেশের এক ক্ষুদ্র পল্লীতে এক দরিদ্র কৃষকের গৃহে রেজা খাঁর জন্ম। শৈশবে পিতার কৃষিক্ষেত্রে কাজ করিয়া এবং পাহাড়ে পাহাড়ে মেষ ও ছাগ চরাইয়াই তাহার দিন কাটিত। দারিদ্রতা-নিবন্ধন শৈশবে লেখাপড়া শিখিবার সৌভাগ্য ঘটিয়া উঠে নাই।

পনেরো বৎসর বয়সে তিনি পারস্যের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ সেনাদল কসাক-বাহিনীতে সামান্য সৈনিকরূপে প্রবেশ লাভ করেন এবং নিজের অসামান্য প্রতিভা ও অসাধারণ কার্য্য-কুশলতার প্রভাবে কয়েক বৎসরের মধ্যেই উক্ত বাহিনীরই এক উচ্চ-অফিসারের পদে উন্নীত হন। এই পদ-প্রাপ্তির পর হইতেই তিনি সমগ্র পারস্যবাহিনীকে পুনর্গঠিত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু পারস্যের তৎকালীন শাসন-ব্যবস্থা তাঁহার এই মহান্ উদ্দেশ্যের অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইল। তিনি আপন চেষ্টায়

কয়েক সহস্র কসাক সৈন্যকে আধুনিক সমর-নীতিতে সুশিক্ষিত করিয়া লইলেন ; এবং এই সেনাদলই তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের দ্রুত উন্নতির পথে প্রধান সহায় বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

রেজা খাঁর দেহ দীর্ঘ ও সুগঠিত এবং কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ ও কর্কশ। তাঁহার উন্নত ললাট এবং অন্তর্ভেদী দৃষ্টি হইতে মনে হয়, তিনি একান্ত কর্ম্মনিষ্ঠ লোক। স্বদেশের সেবা করিয়া বিশ্বের দরবারে তাহাকে তাহার অতীতের গৌরবময় আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যাইবেন—ইহাকেই তিনি জীবনের একমাত্র সাধনা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

ইঙ্গ-পারসিক চুক্তি

মহা-সমর অবসান হইবার পরই ইংরাজ আবার পারস্যে আপনার স্থান দৃঢ়ীভূত করিয়া লইল এবং সঙ্গে সঙ্গেই পারস্য গভর্ণমেণ্টের নিকট ইঙ্গ-পারসিক-চুক্তি-পত্র প্রেরিত হইল। এই চুক্তিপত্র অনুসারে ইংরাজ পারস্যকে কুড়ি লক্ষ পাউণ্ড ঋণ স্বরূপ প্রদান করিবে এবং তৎপরিবর্ত্তে পারস্যের সেনা, রেলওয়ে এবং শুল্কবিভাগ ইংরাজের কর্ত্তৃত্বাধীনে আসিবে।

পারস্যের অধিকাংশ লোকই এই এগ্রিমেণ্টের বিরুদ্ধে দাঁড়াইল। কারণ, তাহারা বুঝিল, এই চুক্তি-পত্র স্বাক্ষরিত হইলে পারস্য যে অবস্থায় উপনীত হইবে, তাহা বৃটিশ

অধীনতারই নামান্তর মাত্র। সুতরাং দিন দিনই ইহার বিরুদ্ধে আন্দোলন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

মন্ত্রীর পর মন্ত্রী

এই সুযোগে ১৯২১ খৃষ্টাব্দে রেজা খান তাঁহার শিক্ষিত সেনাবাহিনীর সাহায্যে তেহ্‌রান অধিকার করিয়া লইলেন এবং চুক্তি-পত্রের বিরুদ্ধে প্রধান আন্দোলনকারী ডাক্তার জিয়াউদ্দীন নামক একজন সংবাদপত্রসেবীকে উজিরে-আজম বা প্রধান-সেনাপতির পদে গ্রহণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই ইঙ্গ-পারসিক চুক্তি পরিত্যক্ত হইল এবং পারস্যে ইংরাজের প্রতিপত্তি এবং সম্মান বহু পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইয়া গেল।

কিন্তু জিয়াউদ্দীন মন্ত্রিপদে অধিক দিন স্থায়ী হইতে পারিলেন না! কারণ, তিনি স্বদেশের মঙ্গলের জন্য যে সব স্কিম করিলেন, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে তাঁহার বহু অর্থের প্রয়োজন হইল। কিন্তু রাজকোষ অর্থশূন্য!

কাজেই তিনি ইংরাজের নিকট হইতেই সেই অর্থসংগ্রহের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু শাহ্ এবং মন্ত্রি-সভা কাহারও ইহা মনঃপূত হইল না। রেজা খানও তাঁহার গতিবিধি সন্দেহের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন এবং কৌশলক্রমে তাঁহার দ্বারা পুলিশ-বিভাগ স্বরাষ্ট্র-সচিবের হস্ত হইতে সমর-সচিবের হস্তে অর্থাৎ রেজা খানের নিজ হস্তে হস্তান্তরিত করাইলেন।

ইহার পরই জিয়াউদ্দীন বুঝিতে পারিলেন, রেজা খান এত শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছেন যে, তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া নিজের সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবেন, জিয়াউদ্দীনের সে ক্ষমতা আর নাই। সুতরাং তিনি পদত্যাগ করিয়া বাগ্দাদে ব্রিটিশ আশ্রয়ে পলাইয়া গেলেন। রেজা খান ইহার পরে মুশিরউদ্দোলাকে প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই কতিপয় সংবাদ-পত্রে তাঁহার অনুসৃত নীতি সম্বন্ধে মতভেদ হওয়ায় তিনিও পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।

তখন খাইয়ামুর সুলতানকে তাঁহার স্থানে নিযুক্ত করা হইল। তিনিও সর্ব্বশক্তিধর রেজার সহিত সমপদবিক্ষেপে চলিতে পারিলেন না। কাজেই তাঁহাকেও পদত্যাগ করিতে হইল। অবশেষে রেজা স্বয়ংই প্রধান মন্ত্রী এবং প্রধান সেনাপতি এই উভয় পদই গ্রহণ করিলেন। এই কয় বৎসর এই পদে থাকিয়া রাজ্যের বহুবিধ উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নিজেও বহুধা শক্তি সংগ্রহ করিয়া লইলেন।

গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা

কিন্তু ইহার মধ্যে পারস্যের হতভাগ্য শাহ্ শুধু সাকী ও শিরাজী লইয়াই মত্ত হইয়া রহিলেন—একবার ফিরিয়াও দেখিলেন না যে রাজ্য আছে কি ধ্বংস হইয়া গিয়াছে! আবার

এই সঙ্কট-সময়েই ইউরোপ-ভ্রমণে তাঁহার বাসনা হইল এবং সুন্দরী প্যারীর বিলাস-স্রোতে ডুবিয়া স্বদেশ এবং [illegible] একেবারে ভুলিয়া গেলেন। নব-জাগ্রত পারস্য তাঁহার এই দায়িত্বহীন স্বেচ্ছাচার সহ্য করিতে পারিল না। দেশের চারিদিক হইতে চীৎকার উঠিল—শাহ্‌কে সরাও।

রেজা খান এই আহ্বানে সাড়া দিলেন এবং শাহ্‌কে পদচ্যুত করিয়া পারস্যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিলেন। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা গেল, শিক্ষায় পশ্চাৎপদ পারস্য তখনও গণতন্ত্রের উপযুক্ত হয় নাই। তাই আবার পারস্য মজলিসে প্রশ্ন উঠিল, আর একজন উপযুক্ত শাহ্—নির্ব্বাচিত করা যায় কি না। তখন জাতীয় বীর রেজা খাঁই ২২৭ ভোটের আধিক্যে পারস্যের "শাহানশাহ্" বলিয়া ঘোষিত হইলেন।

যে ব্যক্তি দরিদ্রতা-নিবন্ধন শৈশবে লেখা-পড়া পর্য্যন্ত শিখিতে পারেন নাই, এইরূপে সেই ব্যক্তিই একান্ত অধ্যবসায় ও অক্লান্ত কর্ম্মশক্তির প্রভাবে আজ বিশ্বের এক শ্রেষ্ঠ পদে অধিরূঢ় হইয়াছেন।

রুষিয়া ও পারস্য

মহাযুদ্ধের সময় যখন রুষিয়াতে বিপ্লব আরম্ভ হইল, তখন কিছুদিনের জন্য রুষিয়া পারস্য হইতে সরিয়া গেল। কিন্তু

এই বিপ্লবের ভিতর দিয়া যে নব রুষিয়া জন্মগ্রহণ করিল, সাম্রাজ্যবাদী ডেনিকিন, রেঙ্গেল এবং অন্যান্য রুষিয়ান নেতাদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া আবার সে ১৯২১ খৃষ্টাব্দে পারস্য-ভূমিতে দেখা দিল। পূর্ব্বেকার হইতে এবার তাহার মনোভাব সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

জারের সময় রুষিয়া পারস্যের সহিত সকল প্রকার ব্যবহারেই অভ্যস্ত ছিল—কখনও একান্ত হিতৈষী বন্ধু—কখনও বা সর্ব্বনাশ-প্রয়াসী ভীষণ শত্রু। কিন্তু ১৯২১ সনে যে রুষিয়া আসিল, সে সত্যকারের বন্ধুত্ব এবং সত্যকারের হিতৈষণা লইয়া আসিল। সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের তেহরাণস্থ প্রথম প্রতিনিধি এম্. থিয়োডোর এ. রথষ্টিন তাঁহার আতাবেগ-পার্কস্থিত দূতাবাস সকল পারসিকের জন্যই মুক্তদ্বার করিয়া রাখিলেন।

ঐ বৎসরেই মস্কোতে রুষিয়া এবং পারস্যের মধ্যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল। রুষিয়ার নিকট পারস্যের যে ৬০,০০০০০ লক্ষ পাউণ্ড ঋণ ছিল, এই সন্ধি অনুসারে তাহা রদ হইয়া গেল এবং যে সকল জমি, বৃহৎ ইমারত, রাস্তা, জেটি এবং জুলফা হইতে তাব্রিজ পর্য্যন্ত রেল-লাইনের অংশ ও উরুমিয়া হ্রদে যে সকল ষ্টীমার তখন পর্য্যন্ত রুষিয়ার অধিকারে ছিল, সকলই পারস্যকে প্রত্যর্পণ করা হইল। ব্যাঙ্ক, ডি. এস্‌কম্‌টি. ডি. পার্‌সি নামক রুষিয়ান ব্যাঙ্কটীও পারস্য গভর্ণমেণ্টের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইল।

সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের এই সকল বন্ধু-ব্যবহারের জন্য রেজা খান রুষিয়ার প্রতি খুবই কৃতজ্ঞ হইলেন বটে, কিন্তু তিনি বোলশেভিক-মতবাদ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। পক্ষান্তরে রুষিয়ার গোপন সাহায্যে পারস্য-দেশীয় যে সকল তুর্কমেন বিদ্রোহ ঘোষণা করিল, তিনি তাহাদিগকে কঠোর-হস্তে দমন করিলেন। এমন কি, বোলশেভিকদিগকে সাহায্য করিতেন, এই সন্দেহে স্বরাষ্ট্র-সচিব আমীর ইখ্‌তোদারকেও গ্রেফতার করা হইল।

পারসিক সৈন্য-বিভাগ

পারসিক সৈন্যদল বহু জাতি দ্বারা বহু বার বহু রূপে গঠিত হইয়াছে—সে প্রাচীন ইতিহাসের কথা। কিন্তু আধুনিক কালেও পারস্য-বাহিনীর অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। রেজা খানের অভ্যুত্থানকাল পর্য্যন্ত যে সকল সেনা-বাহিনী ছিল তন্মধ্যে "দক্ষিণ পারস্য রাইফেল বাহিনী", "কসাক বাহিনী" এবং "পুলিস বাহিনী"-ই প্রধান।

রাইফেল বাহিনীতে সেনা-সংখ্যা ছিল ৬০০০ সহস্র। ইহারা ইংরাজ সামরিক পরামর্শ-দাতার কর্ত্তৃত্বাধীনে শিক্ষিত হইত। কসাক বাহিনীর সংখ্যা ছিল ১০০০০ সহস্র। রুষিয়ান সামরিক বিশেষজ্ঞগণ ইহাদিগকে পরিচালিত করিত। পুলিস

বাহিনীর সংখ্যা ৮৪০০ জন। সুইডেন দেশীয় পরামর্শদাতাদের সাহায্যে ইহারা গঠিত হইয়াছিল।

রেজা খান এখন এই সেনাদলসমূহ পুনর্গঠিত করিয়াছেন এবং বিদেশী পরামর্শদাতাদিগকে সরাইয়া দিয়া তৎস্থানে পারস্য-দেশীয় লোক নিযুক্ত করিয়াছেন। এই নবগঠিত বাহিনী ট্যাঙ্ক, এরোপ্লেন ও দক্ষ গোলন্দাজ সৈন্য দ্বারা সুসজ্জিত করা হইয়াছে এবং সমগ্র বাহিনীকে ছয় ভাগে বিভক্ত করিয়া দেশের বিভিন্ন স্থানে শান্তি-রক্ষার্থ স্থাপন করা হইয়াছে, ইহার প্রত্যেক বিভাগে ৩৫০০০ হাজার সৈন্য।

রেজা খান বেতন-ভুক্ এবং অবৈতনিক সামরিক কর্ম্মচারিগণের শিক্ষার জন্য বড় বড় শহরে স্কুল স্থাপনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত প্রতি বৎসর ৬০ জন করিয়া ছাত্র ফ্রান্সে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য প্রেরিত হয়। বর্ত্তমানে দেশে সামরিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। এই আইনের বলে পারস্যের ২১ বৎসর হইতে ৪০ বৎসর-বয়স্ক প্রত্যেক পুরুষকে সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে এবং প্রত্যেককেই অন্ততঃ দুই বৎসর সরকারের সৈন্য-বিভাগে কাজ করিতে হইবে।

রেজা খান তাঁহার নূতন বাহিনীর সাহায্যে সমগ্র পারস্য দেশকে আবার একীভূত করিয়াছেন। পূর্ব্বে সমগ্র দেশ ব্যাপিয়া অরাজকতা বিরাজ করিতেছিল। প্রাদেশিক সর্দ্দারগণ কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টকে অগ্রাহ্য করিয়া রাজস্ব প্রদান করিতে অস্বীকার করিত।

কুলচিক খাঁ গিলানের জুগালীদের ভিতর এক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিলেন।

মেসোপটেমিয়ার সীমান্তবর্ত্তী 'লার' জাতি প্রতিনিয়তই বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করিতেছিল।

ইব্রাহিম আগা-সিম্‌কোর অধিনায়কতায় কুর্দ্দেরা স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিতেছিল।

আরবিস্থানের সর্দ্দার ও মোহাম্মারার শেখও সেই পন্থাই অবলম্বন করিয়াছিলেন।

কিন্তু রেজা খান তাহাদের সকলকে পরাভূত করিয়া কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টকে সম্মান করিতে তাহাদিগকে বাধ্য করিলেন।

এই গৌরবময় মহান্ কার্য্যের জন্য পুণ্যতীর্থ নজফের ধনাগার হইতে রেজা খানকে মণি-মুক্তা-খচিত এক তরবারি উপহার দেওয়া হইল।

পারস্যের তৈল-সম্পদ

খনিজ সম্পদে পারস্য অত্যন্ত ধনবান। কিন্তু তাহার অতি সামান্য অংশই কাজে লাগানো হইয়াছে। পারস্যের খনিসমূহে এত তৈল জমা আছে যে, পূর্ণভাবে উত্তোলন করিতে পারিলে ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সের সমপরিমাণ তৈল এখানেই পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমান জগতের তৈল-সম্পদের শতকরা পঁয়ষট্টি ভাগই ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স্‌ই প্রদান করে। যাহা হউক, এই

অপূর্ণ ব্যবস্থাতেও পারস্য পৃথিবীর তৈল-উৎপাদনকারী দেশ-সমূহের মধ্যে পঞ্চম স্থান অধিকার করিয়াছে।

পারস্যের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে এংলো-পারশিয়ান অয়েল কোম্পানী কয়েক বৎসর হইল তৈল-উত্তোলন-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে। লাভের শতকরা ষোল অংশ পারস্য গভর্ণমেণ্টকে প্রদান করিতে হয়। উত্তর-অঞ্চলের তৈলখনিসমূহ এখনও কাজে লাগানো হয় নাই। ১৯১৬ সনে খোসথেরিয়া নামক একজন রুষীয় প্রজা উত্তর-পারস্যের খনিসমূহ হইতে তৈল-উত্তোলনের অধিকার লাভ করেন, কিন্তু তিনি এই কার্য্যে অসমর্থ হওয়ায় নর্থ-পারশিয়ান অয়েল্‌স্‌ লিমিটেড নামক এংলো-পারশিয়ান অয়েল কোম্পানীর অন্য আর এক শাখার নিকট তাহার স্বত্ব বিক্রয় করিয়া ফেলেন।

সুতরাং যখন যুদ্ধ শেষ হইয়া গেল, তখন এংলো-পারশিয়ান অয়েল কোম্পানী উত্তর-অঞ্চলের খনিসমূহে তৈল-উত্তোলনের অধিকার দাবী করিয়া বসিল। কিন্তু পারস্য গভর্ণমেণ্ট খোস-থেরিয়ার স্বত্ব বিক্রয় করিবার অধিকার নাই, এই অজুহাতে এংলো-পারশিয়ান অয়েল কোম্পানীর দাবী অগ্রাহ্য করিল। ইহার পর ইহারই জন্য আমেরিকার ষ্ট্যান্‌ডার্ড অয়েল কোম্পানী আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন ইংরাজ এবং আমেরিকান কোম্পানীদের মধ্যে মনোমালিন্য দেখা দিল। কিন্তু শীঘ্রই বিবাদ মিটমাট হইয়া গেল। স্থির হইল, ষ্ট্যান্‌ডার্ড অয়েল কোম্পানীকে মেসোপটেমিয়ার খনিসমূহে কিছু অধিকার প্রদান

করা হইবে এবং তৎবিনিময়ে এংলো-পারশিয়ান অয়েল কোম্পানী উত্তর পারস্যের খনিসমূহে যে লাভ হইবে, তাহার কিয়দংশ পাইবে।

ইংরাজ এবং আমেরিকান অয়েল কোম্পানীর এই চুক্তিপত্র দেখিয়া রুষিয়া একটু ভীত হইয়া পড়িল এবং এই ব্যবস্থাতে আপত্তি উত্থাপন করিল। ফলে পারস্য গভর্ণমেণ্ট ষ্ট্যান্‌ডার্ড অয়েল কোম্পানীকে অধিকার-দানে অস্বীকার করিল। অবশেষে গত পূর্ব্ব বৎসর পারস্য গভর্ণমেণ্টকে কিঞ্চিদধিক দুই লক্ষ পাউণ্ড অগ্রিম ঋণ প্রদান করিবে, এই শর্ত্তে পারস্যের উপরি-উক্ত অংশেই তৈল উত্তোলনের অধিকার পাইবার জন্য সিন্‌ক্লেয়ার কোম্পানী আবেদন করিয়াছিল। কিন্তু এই সময় তেহরাণস্থ আমেরিকার ভাইস-কন্‌সাল রবার্ট ইম্‌বোরি নিহত হওয়ায় কোম্পানী ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স্ হইতে ঋণ সংগ্রহ করিতে পারিল না। সুতরাং অনুমতিও দেওয়া হইল না।

রেল-লাইন

পারস্য বহির্জগতের সহিত অনেকটা বিচ্ছিন্ন। কারণ, তাহার অভ্যন্তরে অথবা সীমান্তবর্ত্তী দেশসমূহে রেলওয়ে-বিস্তার খুব কমই হইয়াছে। উষ্ট্র এবং অশ্বের সাহায্যেই ইহার

আমদানী-রপ্তানী কার্য্য সমাধা হয়। কিন্তু অল্প কয়েক বৎসর যাবৎ অবস্থার অনেকটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পূর্ব্বে লোকে একমাত্র বস্‌রা হইয়া পারস্যে যাইতে পারিত, কিন্তু এখন বাগ্দাদ হইতে তেহরাণ পর্য্যন্ত সপ্তাহে একবার করিয়া মোটর যাতায়াত করে।

বৃটিশ এক তুর্কি রেল-লাইন সহ শীঘ্রই সীমান্তবর্ত্তী রাজ্য-সমূহের সহিত পারস্যের যোগাযোগ সাধন করিয়া দিবে। দেশের অভ্যন্তরে মোটর লরী ও মোটর ট্রাক্‌সমূহ অশ্ব ও উষ্ট্রের স্থান অধিকার করিতেছে। এতদ্ব্যতীত পারস্য সরকার এখন রাজ্যের সর্ব্বত্র রেলওয়ে লাইন বসাইবার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করিতেছেন। পারস্য মজলিসের মন্ত্রণাসভা পারস্য উপসাগর হইতে কাস্পিয়ান হ্রদ পর্য্যন্ত রেল-লাইন বিস্তারের জন্য ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন এবং উহার প্রথম কিস্তীতে পাঁচ লক্ষ তুমান দেওয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে।

রাজস্ব-বিভাগের সংস্কার

১৯২৩ সনের শরৎকালে ওয়াশিংটনের স্বরাষ্ট্র-বিভাগের অর্থনীতি-বিষয়ক পরামর্শদাতা ডাঃ এ. সি. মিল্‌স্‌পাগ বার্ষিক ১৫০০০ হাজার ষ্টারলিং বেতনে পাঁচ বৎসরের জন্য পারস্যের রাজস্ব-বিভাগের ডিরেক্টর-জেনারেলের পদে নিযুক্ত হন।

তিনি এক দল রাজস্ব-বিশারদ সহকারীর সাহায্যে ইতিমধ্যেই এই বিভাগের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছেন। কর-প্রথার পরিবর্ত্তন করিয়া তিনি দেশের সর্ব্বত্র রাজস্ব আদায় করিতে সমর্থ হইয়াছেন। রেজা খানের নব-গঠিত সেনাদল এই রাজস্ব-আদায়-বিষয়ে তাঁহার যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। তিনি সিভিল সার্ভিস আইন প্রবর্ত্তন ও তৎসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পদের সৃজন করিয়া পদানুযায়ী বেতন নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। তামাকের শুল্ক বৃদ্ধি করা হইয়াছে। ডাঃ মিল্‌স্‌পাগ কার্য্যভার গ্রহণের প্রথম বৎসরের শেষেই রাজ্যের আয়-ব্যয় সমান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। চল্‌তি ব্যয়ের জন্য পারস্য গভর্ণমেণ্টের এখন আর বিদেশী ঋণের প্রয়োজন হয় না।

ঐ বৎসরই (১৯২৩) পূর্ব্ব বৎসর (১৯২২) অপেক্ষা ১০০০০০০০ এক কোটী পাউণ্ড মূল্যের জিনিস বেশী রপ্তানী হয়। চিনি এবং চায়ের উপর এক নূতন কর বসানো হইয়াছে, ঐ আয়ে রেলওয়ে লাইন তৈয়ারী করা হইবে। উত্তর পারস্যে এক জার্ম্মান উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছে। সেখানে আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক কৃষি-যন্ত্রাদি জার্ম্মানী হইতে আমদানী করা হইতেছে। দুনিয়ার বাণিজ্যের বাজারে পারস্যের মুদ্রাঙ্কনের মূল্য ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে, দেশে কাগজের মুদ্রা মোটেই ব্যবহৃত হয় না এবং তাহার জাতীয় ঋণও বেশী নহে। কাজেই পারস্যের ভয়ের কোন কারণ নাই, তাহার ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল।

স্বদেশিকতা, ধর্ম্ম ও শিক্ষা

রেজা খান স্বদেশী শিল্পের খুব উৎসাহ-দাতা। পারস্যের মিলসমূহে যে বস্ত্র তৈয়ারী হয়, কেবলমাত্র সেই বস্ত্রেই তিনি তাঁহার পোষাক প্রস্তুত করেন এবং গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণকে তাহাই ব্যবহার করিতে আদেশ দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত কম্বল, মৃৎপাত্র, পিত্তল ও রৌপ্যের জিনিষ নির্ম্মাণেও খুব উৎসাহ দিয়া থাকেন।

যদিও দুর্ভাগ্যবশতঃ ১৯২৬ সনে মেজর ইম্‌ব্রিম হত্যা-কাণ্ড ঘটিয়া যায়, তথাপি ইহা জোরের সহিতই বলা যাইতে পারে যে, ধর্ম্ম সম্বন্ধে পারস্যে যথেষ্ট উদারতা ও স্বাধীনতা রহিয়াছে। খ্রীষ্টান, ইহুদী, পার্সী এবং বাহাইগণ, প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধর্ম্মমন্দিরে স্বাধীনভাবে উপাসনা-কার্য্য সমাধা করিতে পারে।

শাহের সিংহাসন-চ্যুতির পরেই রেজা খান সমস্ত মদের দোকান এবং জুয়া-খেলার আড্ডা বন্ধ করিয়া দেন।

এখন সংবাদপত্রের সংখ্যাও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রায় সকল পত্রিকাই রেজা খানের গণতন্ত্র স্থাপনের পক্ষে ছিল। তবে সকল সংবাদপত্রই খুব স্বাধীন মতাবলম্বী নয়। কখনও য়ুরোপীয়দিগের বিরুদ্ধে অত্যধিক লেখালেখির দরুণ এবং

কখনও বা রেজা খানকে অতিরিক্ত প্রশংসা করিবার নিমিত্ত তিনি পত্রিকার সম্পাদকদিগকে শাস্তি প্রদান করিতেও বিরত হন না।

খৃষ্টান মিশনারী এবং বাহাইদিগকে বালকবালিকাদের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়-স্থাপনে খুব উৎসাহ দেওয়া হয়। প্রতি বৎসরই দলে দলে ছাত্র উচ্চতর পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভের জন্য বিদেশে প্রেরিত হয় এবং এই সকল ছাত্র শিক্ষিত হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিলে তাহাদিগকে রাজ্যের উচ্চপদে নিযুক্ত করা হয়।

রেজা খান্ ও মোস্‌লেম জগৎ

রেজা খান ইস্‌লামের একত্বে দৃঢ় বিশ্বাসবান্। পারস্যের অধিকাংশ লোকই শিয়া মতাবলম্বী—এই জন্য তিনি বিশেষ কিছুই মনে করেন না। তিনি বলেন—"আমরা আগে মুসল-মান, তারপর শিয়া অথবা সুন্নী।"

একবার তিনি ইস্‌লামের বিচ্ছিন্ন শক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন—"হায়, যে ইস্‌লাম ইতিপূর্ব্বে মহাসাগর ছিল আজ সে সামান্য ডোবা মাত্র।" ইস্‌লামের সুপ্ত একতা ফিরিয়া আনিবার জন্য তিনি তুরস্ক এবং আফগানি-স্থানের সহিত রাজনৈতিক এবং বাণিজ্যবিষয়ক সন্ধিস্থাপন করিয়াছেন।

গ্রীসের উপর তুর্কীর জয়ে তিনি এতদূর আনন্দিত হইয়াছিলেন যে, তিনি গাজী মোস্তফা কামাল পাশার নিকট উপহার স্বরূপ মণি-মুক্তা-খচিত একটী তরবারি প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং তদবধি তিনি এই তুর্কী বীরের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিতে চেষ্টা করিতেছেন।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যখন মোস্তাফা কামালপাশা তুর্কী-আইন-সমূহ আধুনিকভাবে বিধিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিলেন, তখন রেজা খানও পারস্য-দেশীয় আইন-সংস্কারের জন্য ফরাসী আইনবেত্তা নিযুক্ত করিলেন।

বর্ত্তমান জগৎ পারস্য সম্বন্ধে খুব কমই জানে। সে তাহার অতীতের গৌরব হারাইয়া অরাজকতা ও অধঃপতনের গভীরতম গর্ভে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছিল। ভবিষ্যতের সকল আশা, সকল আলো যেন চিরতরে নিভিয়া গিয়াছিল।

আজ রেজা খানের যাদুকরী হস্তের সোনার কাঠির স্পর্শে সে মৃত দেহে আবার যেন প্রাণের সঞ্চার হইয়াছে—হয়ত অদূর ভবিষ্যতে সেদিন আসিতেছে, যখন বিস্ময়স্তব্ধ জগৎ তাঁহার বিজয়দীপ্ত গৌরবের দিকে মুগ্ধ হইয়া চাহিয়া থাকিবে।

আফগানিস্থান

প্রস্তাবনা

গল্পারম্ভে দুইটী ঘটনার কথা বলিতে চাই। এই দুইটী ঘটনার কথা স্মরণে না রাখিলে, মনে হয়, আফগানিস্থানের ইতিহাসকে অথবা আফগান জাতিকে সম্যক বোঝা যায় না।

মানব-শিশু যখন প্রথম এই পৃথিবীর আলোকে আসে, তখন তাহাকে অভিনন্দন করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন প্রথা আছে। আফগান-শিশু যে মুহূর্ত্তে প্রথম মাটীর পৃথিবীতে আসে, সেই মুহূর্ত্তে তাহাকে অভিনন্দন করিবার জন্য, শাঁখ নয়, বাজনা নয়, বন্দুক ডাকিয়া উঠে;—বন্দুকের জয়-ধ্বনিতে আফগান-শিশু জন্মগ্রহণ করে!

শিশু-কন্যা হইলে পাঁচ কিংবা সাতবার বন্দুক ছোড়া হয়; আর শিশু-পুত্র যদি হয়, তাহা হইলে চৌদ্দবার বন্দুক ছোড়া হয়। যখনই শিশু জন্মগ্রহণ করুক, গভীর নিশীথে অথবা প্রথম-প্রভাত-আলোকে, দরিদ্রের কুটীরে অথবা ধনীর প্রাসাদে, জাতির

এই নব-অভ্যাগতকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য বন্দুকের অভিনন্দন-ধ্বনি জাগিয়া উঠিবেই। আফগান-শিশুর এই জন্ম-মাঙ্গলিক!

মাতার স্তনে যদি দুগ্ধ না থাকে, যদি ধাত্রীর প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে এমন ধাত্রীর অনুসন্ধান করা হয়, যে স্বাস্থ্যবান্ ও অকলঙ্ক চরিত্রের। সর্ব্বদেশেই ধাত্রী-নির্ব্বাচনে ইহাই দেখা যায়। কিন্তু আফগানিস্থানে এই আচারের আর একটু পার্থক্য আছে। ধাত্রীর স্বামী যদি কাপুরুষ অথবা দুর্ব্বল হয়, অথবা কোনও যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছে, জানা যায়, তাহা হইলে তাহাকে আর ধাত্রী করা হয় না!

আফগান ইতিহাসের নিত্য জ্বলন্ত দাবানলের মূলসূত্র, মনে হয়, এই দুইটী ঘটনার মধ্যে রহিয়া গিয়াছে।

* * * *

কিন্তু আফগানিস্থানের অতীত ইতিহাস পুরাণ-কাহিনীর মধ্যে বিলুপ্ত ;—সেই বিলুপ্ত কাহিনীর কঙ্কাল লইয়া ঐতি-হাসিক গবেষণা করিতে চাহি না—আমি চাহি শুধু বর্ত্তমান জগতের আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে আফগান জাতির অন্তর ও বাহিরের কাহিনীকে পাঠকবর্গের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে।

ইতিহাসের দীর্ঘপথ বাহিয়া যখনই বাহির হইতে যে কোন সভ্যতা ভারতে পদার্পণ করিয়াছে, তাহারাই আফগানিস্থানের কঠিন প্রস্তরে ক্ষণিকের জন্য তাহাদের পদ-চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। কিন্তু আফগান-পাথরের বুকে কোনও জাতির বিজয়-স্মৃতি-চিহ্ন দাগ কাটিয়া বসিতে পারে নাই!

সেকেন্দর শাহ্ হইতে আরম্ভ করিয়া নাদের শাহ্ পর্য্যন্ত কত অগণন বিজেতার রথচক্র এই আফগানিস্থানের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে। কিন্তু মোগল-সম্রাটেরা, বিশেষতঃ শাহ্-জাহান, আপনাদের অসামান্য প্রীতির বলে এই দেশে আপনাদের শাসনের বহু স্মৃতিচিহ্ন পাথরে রাখিয়া গিয়াছেন। অনেক হিন্দু এবং বৌদ্ধ মূর্ত্তিও পাওয়া যায়—হিন্দু রাজত্বের স্মৃতিচিহ্ন-রূপে।

কিন্তু স্মৃতির যাদুঘরে যাইবার ইচ্ছা আমার নাই—জীবনের জাগরণালোকে আজ ভ্রমণ করিতে চাই। তাই যেদিন হইতে বিদেশী বণিকের অভিযানে ও মোগল সাম্রাজ্যের পতনে প্রাচ্যে, তথা জগতে, এক নূতন যুগের সৃষ্টি হইল—সেইখান হইতে বর্ত্তমান আফগানিস্থানের কাহিনী আরম্ভ হইবে।

ঝড়ের পূর্ব্বে

ইংরাজ যখন ভারতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তখন আফগানিস্থানের আভ্যন্তরিক অবস্থা অত্যন্ত বিশৃঙ্খলায় ছিল। ভারতেও তখন ভারতীয় সমস্ত শক্তি এক রকম নিষ্প্রভ হইয়া আসিয়াছিল। শুধু পাঞ্জাবে তখন রণজিৎ সিংহের অধীনে শিখশক্তি অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।

১৮৩৯ খৃঃ অঃ বৃটিশ-ভারতের সহিত লর্ড মিণ্টোর আমলে রণজিতের চুক্তি হয় যে, তিনি পূর্ব্ব দিকে আর রাজ্য-বিস্তার

করিতে পারিবেন না। স্বভাবতঃই সেইজন্য তাঁহার নজর আফগানিস্থানের দিকে গিয়া পড়িল। ওধারে পারশ্যকে তাহার উত্তরাংশের কিছু রুষদের দিয়া দিতে হইয়াছিল, সেই কারণে তাহারাও ভাবিতেছিল, দক্ষিণ-পূর্ব্বের আফগানিস্থানটুকু দখল করিয়া লইলে যদি ক্ষতিপূরণ হয়।

এদিকে আফগানিস্থানের অভ্যন্তরে নাদের শাহের সেনাপতি এবং পরে আফগানিস্থানের বাদশাহ্‌ আহ্‌মদ শাহ্‌ দোর্‌রানীর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র তৈমুর শাহ্‌ দীর্ঘ দ্বাবিংশতি বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। তাহার পর হইতেই আফগানিস্থানে যত অশান্তি শুরু হইল, আজও তাহার শেষ হইয়াছে কিনা কে জানে!

তৈমুর শাহের পর তাঁহার পুত্র শাহ্‌ জমাঁ সিংহাসনে আরোহণ করেন। শাহ্‌ জমাঁর রাজত্বকাল হইতেই কাবুলের সিংহাসনের জন্য প্রবলরূপে গৃহবিবাদ জাগিয়া উঠিল। সেইদিন হইতে আফগানিস্থানের উপজাতিদের মধ্যে যে বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠে, আজও তাহা সমানে জ্বলিতেছে।

শাহ্‌ জমাঁর মন্ত্রী পাওয়ান্দ খাঁ অনেক কৌশলে উপজাতিদের কতকটা প্রশমিত করেন। এই সময় অনেক সর্দ্দারের প্রাণ-দণ্ড হয়। কিন্তু অবশেষে শাহ্‌ জমাঁর ভ্রাতা মাহ্‌মুদ শাহ্‌ সিংহাসন দখল করেন। কিন্তু তাহার অল্পকালের মধ্যেই ভ্রাতা সুজাউল-মুল্ক ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে মাহ্‌মুদ শাহ্‌কে সিংহাসনচ্যুত করিয়া বাদশাহ্‌ হন।

কিন্তু মাহ্‌মুদ শাহ্ এই পরাজয় নীরবে সহ্য করিলেন না। মাহ্‌মুদ শাহ্ দলবল সংগ্রহ করিয়া পুনরায় সুজাউল-মুল্ককে আক্রমণ করিলেন। ফলে, পরাজিত হইয়া সুজাউল-মুল্ক আফগানিস্থান হইতে পলাইয়া আসিয়া আফগানের চির-শত্রু রণজিৎ সিংএর আশ্রয় গ্রহণ করেন।

কিন্তু ইহাতেই এই ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের এবং অন্তর্বিপ্লবের শেষ হইল না। মাহ্‌মুদ শাহ্ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া স্বীয় মন্ত্রী পাওয়ান্দ খানের পুত্র ফতেহ্ খানের উপর কোনও কারণে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে হত্যা করেন। সুতরাং পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য দোস্ত মোহাম্মদ খান্ বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন এবং অবশেষে শাহ্ মাহ্‌মুদকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া দোস্ত মোহাম্মদ খান্ আপনাকে আফগানিস্থানের বাদশাহ্ বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

এখানে আফগান ও ভারতের ইতিহাসের একটী বিশিষ্ট ঘটনার কথা বলা প্রয়োজন।

ভারতের গৌরব-স্মৃতি, জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মণি কোহিনুর, একদিন যাহা মোগল বাদশাহ্‌দের শিরোভূষা ছিল, তাহা সর্ব্বশেষ সুজাউল-মুল্কের নিকট থাকে। রণজিৎ সিংহ এই ঐতিহাসিক মণি কৌশলে আদায় করেন।

এই ঘটনার পর রণজিৎ সিংহের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া সুজাউল-মুল্ক লুধিয়ানায় পলাইয়া আসিয়া অবশেষে ইংরাজের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

প্রথম আফগান যুদ্ধ ও দোস্ত মোহাম্মদ খান্

দোস্ত মোহাম্মদ খানের রাজত্বকাল হইতেই বৃটীশের সঙ্গে আফগানের সংঘর্ষ লাগে।

দোস্ত মোহাম্মদ খান্ যখন কাবুলের সিংহাসনে, তখন ভারতবর্ষ বৃটীশ-ভারতে পরিণত হইয়া গিয়াছে। ভারতের তদানীন্তন গভর্ণর লর্ড অকল্যাণ্ড স্থির করিলেন যে, রণজিৎ সিংহের সাহায্যে দোস্ত মোহাম্মদকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাহার স্থলে পলায়িত সুজাউল-মুল্ককেই কাবুলের সিংহাসনে বসাইতে হইবে।

দোস্ত মোহাম্মদ খান্ অগত্যা রুষের সঙ্গে সন্ধি করিলেন। এদিকে ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে পলাতক শাহ্‌সুজাকে লইয়া ইংরাজ সৈন্য বীরদর্পে কাবুলে প্রবেশ করিল। দোস্ত মোহাম্মদ খান্ নিজেকে ধরা দিলেন ; এবং ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের নজরবন্দী-রূপে তাঁহাকে কলিকাতায় আনা হয়।

কিন্তু এই ঘটনার ফলে আফগানিস্থানের চারিদিকে অসন্তোষ জাগিয়া উঠিতে লাগিল ;—এবং একদিন ক্ষুব্ধ জনতা বিদ্রোহের অগ্নিমূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইল।

ইংরাজ সেনাপতি ম্যাকন্যাগটেন অগত্যা সন্ধির কথা আনিলেন এবং বলিলেন যে, দোস্ত মোহাম্মদকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে, এবং শাহ্ সুজাকে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হইবে।

তাহার পরিবর্ত্তে দোস্ত মোহাম্মদের পুত্র আকবর খান্ শুধু ইংরাজদের সঙ্গে থাকিয়া তাঁহাদের সীমান্ত পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যুক্তি কার্য্যে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই ম্যাকন্যাগটেন গুপ্ত-আততায়ীর হস্তে নিহত হন।

অবশেষে কামান ও জিনিষপত্রসমূহ কাবুলে রাখিয়া দিয়া দৈব ও আকবর খানের উপর নির্ভর করিয়া ১৬০০০ সৈন্য কাবুল ছাড়িয়া ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করে। প্রত্যাবর্ত্তনের পথে প্রতিহিংসাপরায়ণ উপজাতিরা লুকাইয়া ছিল। তাহাদের হাত হইতে ইংরাজ সৈন্যদের রক্ষা করিবার কোনও শক্তি আকবর খানের ছিল না।

সমগ্র জগতের ইতিহাসে, বোধ হয়, এত বড় ভয়াবহ প্রত্যাবর্ত্তন আর হয় নাই। এক সপ্তাহের মধ্যে এই ১৬০০০ সৈন্যের মধ্যে ডাঃ ব্রিগুন নামক মাত্র একজন ব্যক্তি রক্তাক্ত-কলেবরে জালালাবাদে প্রবেশ করেন।

অন্তর্বিপ্লবের সূচনা ও শের আলী খান্

এদিকে দোস্ত মোহাম্মদ খান্ পুনরায় কাবুলের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে পুনরায় আফগানিস্থানে সাময়িক শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু দোস্ত মোহাম্মদ খানের মৃত্যুর পর হইতেই কাবুলের সিংহাসনের উত্তরাধিকার-সূত্র লইয়া ভয়াবহ অন্তর্বিপ্লবের দাবানল জ্বলিয়া উঠিল!

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে দোস্ত মোহাম্মদ খান্ পরলোক গমন করেন। তখন তাঁহার ষোলজন পুত্র বর্ত্তমান। কিন্তু দোস্ত মোহাম্মদ খান্ জীবদ্দশায় তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আফজল খান্‌কে কান্দাহারের শাসনকর্ত্তা রূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রিয় পুত্র শের আলী খান্ তাঁহার নিকটে থাকিতেন। পিতার মৃত্যুর পর অমাত্যবর্গের সহায়তায় শের আলী খান্ তৎক্ষণাৎ আপনাকে 'আমীর' বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

এই সময় আফগানিস্থানের ইতিহাসে সিংহাসনের লোভে যে অযথা হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়, তাহা আফগানিস্থানের ইতিহাসকে মসীরেখান্বিত করিয়া রাখিয়াছে। শের আলী খান্ সিংহাসনের পথ পরিষ্কার রাখিবার জন্য কয়েকজন ভ্রাতাকে হত্যা করেন এবং অন্যান্য ভ্রাতাদের ক্ষমতারও হ্রাস করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ফলে পুনরায় আফগানিস্থানের ঈষৎ নির্ব্বাপিত অগ্নিকুণ্ডে আবার লেলিহান শিখায় শতজিহ্বা বিস্তার করিয়া বিপ্লবাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল।

কান্দাহার হইতে আফজল খান্ ভ্রাতার এই মদমত্ততা সহ্য করিলেন না। অচিরেই শের আলীর সহিত আফজল খানের তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া গেল। আফজল খান্ তাঁহার সুযোগ্য পুত্র আবদুর রহমান খাঁর সহায়ে ১৮৬৬ সালে শের আলীকে কাবুল হইতে বিতাড়িত করেন। তখন শের আলী কান্দাহারেই আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরের বৎসর শের আলী কান্দাহার হইতেও বিতাড়িত হইয়া শেষ-আশ্রয় স্বরূপ হীরাটে আসেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, ১৮৬৭ সালের অক্টোবর মাসে আফজল খান্ পরলোক গমন করেন। জ্যেষ্ঠপুত্র হিসাবে আবদুর রহমান খান্ই সিংহাসনের উত্তরাধিকারী, কিন্তু তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতার জন্য সিংহাসন ছাড়িয়া দিলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা আজিম খাঁ কাবুলের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন।

কিন্তু শের আলী খান্ পরাজিত হইয়া নিশ্চল হইয়া বসিয়া ছিলেন না। ১৮৬৮ সালের এপ্রিল মাসে শের আলীর পুত্র ইয়াকুব খান্ পুনরায় কান্দাহার দখল করিলেন এবং তাহার কয়েকমাস পরেই শের আলী স্বয়ং কাবুল আক্রমণ করিলেন।

ঐ বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসেই শের আলী কাবুল অধিকার করিয়া লন এবং আফজল খাঁর পুত্রদ্বয় স্বদেশ হইতে পলাইয়া আত্মরক্ষা করিলেন; কিন্তু শের আলীকে তাঁহারা ভুলিলেন না। দূর প্রবাসের একান্ত নির্জ্জনে বসিয়া প্রবাসী আফগানদ্বয় ভাবিতে লাগিলেন, কি ভাবে পুনরায় আফগানিস্থানে প্রবেশ করা যায়, কি ভাবে স্বজাতির মধ্যে সগৌরবে পুনরায় অধিষ্ঠিত হওয়া যায়।

দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ ও বৃটীশ-নীতি

এদিকে শের আলী সিংহাসনে আরোহণ করিয়া বিপুল প্রতাপে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। কিন্তু আফগানিস্থানের সহিত মৈত্রীর বন্ধনকে আরও দৃঢ়তর করা ও ভারতের

সীমান্তকে আরও সুরক্ষিত করিবার আয়োজনের জন্য বৃটীশ শশব্যস্ত হইয়া উঠিল। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে বৃটীশ সরকারের পক্ষ হইতে গভর্ণর-জেনারেল লরেন্স আমীর শের আলীকে বহু অস্ত্রশস্ত্র ও নয় লক্ষ টাকা উপঢৌকন স্বরূপ পাঠাইলেন।

কিন্তু কয়েকমাস যাইতে না যাইতে ইংরাজ রাজনৈতিকদের এই মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তন ঘটিল। ইংরাজ দেখিল যে, আফগানিস্থানের মত প্রতিবেশীকে সংযত করিয়া না রাখিলে বৃটীশ-ভারতের কল্যাণ নাই। আফগানিস্থানের ভৌগোলিক অবস্থান এবং আফগান-জাতির বীরত্ব ও অসমসাহসিক উন্মাদনা বৃটিশ শান্তির ব্যাঘাত যে ঘটাইবেই, তাহা তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছিলেন।

কিন্তু এই সিদ্ধান্ত-অনুসারে কাজ করিতে গিয়া ইংরাজ রাজনীতিকগণ ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, ইংলণ্ডেরই মত আফগানিস্থান একটা স্বাধীন দেশ। ইংরাজের অসুবিধা হইবে বলিয়া আফগানিস্থানকে তাহার নিজের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিতে হইবে, এবং না করিলে যুদ্ধের দ্বারা তাহাকে বশে আনিতে হইবে, ইহাই হইল, সেই-সময়কার বৃটীশের আফগান-নীতি।

লর্ড লীটন শের আলীর নিকট প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন যে, আফগান দরবারে একটী বৃটীশ মিশন পাঠান হইবে। শের আলী কোন কারণে ইহা বিনীতভাবে প্রত্যাখ্যান করিলেন। কিন্তু লর্ড লীটন আমীর শের আলীর এই প্রত্যাখ্যানকে বেশ ভাল ভাবে গ্রহণ করিলেন না।

এই সূত্রে পুনরায় আফগান-ইংরাজ সংঘর্ষ দেখা দিল ;—ইংরাজ-সৈন্য তিন দিক দিয়া আফগানিস্থান আক্রমণ করিল। শের আলী সিংহাসন ত্যাগ করিয়া পলাতক হইলেন এবং একান্ত অসহায় অবস্থায় ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ২১শে ফেব্রুয়ারী শের আলী মজার-ই-শরিফে দেহত্যাগ করেন।

শের আলীর এই রকম অসহায় অবস্থায় মৃত্যু ঘটিবার পর বৃটীশ সরকার ইয়াকুব খান্‌কে আমীর বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের মে মাসে গণ্ডমেক নামক যায়গায় নূতন আমীরের সহিত ইংরাজের সন্ধি হইল। সন্ধিতে স্থির হইল যে, বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের পরামর্শ-অনুসারে আফগানিস্থান অন্যান্য শক্তির সহিত সন্ধি করিতে পারিবে, কাবুলে স্থায়ী বৃটীশ রেসিডেণ্ট রাখিতে হইবে, এবং হীরাট ও অন্যান্য নগরে বৃটীশ এজেণ্ট থাকিবে।

কিন্তু ইয়াকুব খানের দরবারে বৃটিশ-মিশনকে দেখিয়া কাবুলী জনসাধারণ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। আমীর আবদুর রহ্‌মানের আত্মচরিত হইতে জানা যায় যে, কাবুলে আসিয়া বৃটীশ রাজদূত আফগান জাতির এই মনস্তত্ত্বের কথা একদম ভুলিয়া স্বীয় ক্ষমতা নানাভাবে জাহির করিতে লাগিলেন। রাজকার্য্যেও তিনি তাঁহার হুকুম চালাইতে লাগিলেন।

কিন্তু ইংরাজ রাজদূতের এই অনধিকার-চর্চ্চায় অচিরেই আফগান জন-সাধারণের মধ্যে একটা প্রবল বিদ্রোহ-প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিল এবং তাহার ফলে ইংরাজ রাজদূত স্যার লুই

ক্যাভেনারীর গৃহ আক্রমণ করিয়া ক্ষুব্ধ জনতা তাঁহাকে হত্যা করে।

এই হত্যাকাণ্ডের সংবাদে বৃটীশ রাজনৈতিকরা ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন এবং এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ লইবার জন্য রবার্টসের অধিনায়কত্বে কাবুলে পুনরায় এক বিরাট বৃটীশ-বাহিনী প্রেরিত হইল। ইয়াকুব খান্ মহাবিপদে পড়িলেন। তিনি বৃটীশবাহিনীকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য আগাইয়া দেখা করিতে আসিলেন।

কিন্তু ইয়াকুব খানের উপর ইংরাজের আর তিলমাত্র বিশ্বাস ছিল না। ইয়াকুব খান্‌কে সেই অবস্থায় বন্দী করিয়া ১৮৭৯ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে ভারতে পাঠান হইল। কাবুল ও কান্দাহার দখল করিয়া বিজয়ী ইংরাজ-সৈন্য রাজধানীতে প্রবেশ করিল।

আমীর আবদুর রহমান খান্

আফগানিস্থানের ভিতরের অবস্থা যখন এই রকম, তখন আফগানিস্থানের বাহিরে সুদূর প্রবাসে বসিয়া আফগানিস্থানের ভাবী উদ্ধার-কর্ত্তা এবং উনবিংশ-শতাব্দীর এশিয়ার একজন বিশিষ্ট রাজনৈতিক প্রতিভা, আবদুর রহমান খান্ একদৃষ্টে স্বদেশের দিকে চাহিয়াছিলেন।

সর্দ্দার আবদুর রহমান খান্ মাত্র একশত অশ্বারোহী বন্ধু লইয়া নানা প্রকারে বিপদাপদের মধ্য দিয়া আফগানিস্থানের

দিকে রওয়ানা হইলেন। সেই সময় এক দৈব ঘটনা তাঁহার চিত্তকে আরও দৃঢ় করিয়া তোলে।

কিছুদূর অগ্রসর হইবার পরই আবদুর রহমানের মনে হইল যে, তাঁহাদের পশ্চাতে যেন অসংখ্য অশ্বারোহী সৈন্য আসিতেছে। তাহাদের আগমন-ধ্বনিতে সমস্ত নির্জ্জন প্রদেশ ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। সর্দ্দার ফিরিয়া চাহিলেন, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। পুনরায় যেমনি চলিতে যাইবেন—অমনি আবার সেই বিপুল বাহিনীর আগমনের বিরাট শব্দ! শব্দ ক্রমশঃ আগাইয়া আসিতে লাগিল এবং বিস্ময়-নিস্তব্ধ সর্দ্দার আবদুর রহমান খান্ স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিলেন যে, সেই শব্দ ক্রমশঃ তাঁহার সৈন্যমণ্ডলীর মধ্যে আসিয়া বিলুপ্ত হইয়া গেল! ঊর্দ্ধ আকাশের দিকে চাহিয়া লীলাময়ের অসীম লীলার কথা মনে করিয়া, লক্ষবলে বলীয়ান্ হইয়া সর্দ্দার আবদুর রহমান আফগানিস্থানের দিকে অগ্রসর হইলেন।

আফগানিস্থানে আসিবার পথে তাঁহার অনেক বিপদাপদ ঘটিয়াছিল, কিন্তু তিনি যেখান দিয়াই গিয়াছেন, সেইখানেই সাধারণের বিপুল সম্বর্দ্ধনা পাইয়াছিলেন। তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও আদর্শবাদিতার প্রভাবে দলে দলে লোক তাঁহার পতাকার তলে সমবেত হইতে লাগিল। কিন্তু তিনি অকারণ রক্তপাতে তাঁহার সিংহাসনের পথ কর্দ্দমাক্ত করিতে চান নাই।

সর্দ্দার আবদুর রহ্মান যেখান দিয়া যাইতে লাগিলেন, সেইখানেই তাঁহার উদ্দেশ্যের কথা প্রচার করিতে লাগিলেন যে,

তিনি আফগানিস্থানে মুসলমান ভ্রাতাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসেন নাই—তিনি চলিয়াছেন বিধর্ম্মীর হাত হইতে আফগানিস্থানকে মুক্ত করিবার জন্য।

এই সময়ে তিনি ইংরাজদের বিপক্ষে সমস্ত উপজাতিদের উত্তেজিত করিয়া তোলেন। দেখিতে দেখিতে এক বিরাট সৈন্য-বাহিনী সর্দ্দার আবদুর রহমানের পতাকার তলে জড় হইল।

দূর হইতে ইংরাজ এই সমস্ত লক্ষ্য করিতেছিল এবং আবদুর রহমানের মত একজন শক্তিশালী বন্ধুকেই তাহারা খুঁজিতেছিল! ইংরাজের বিশ্বাস হইল যে, এই ব্যক্তি যদি আফগানিস্থানের সিংহাসনে বসে, তাহা হইলে এই দেশ সম্ভবতঃ সু-শৃঙ্খলায় পরিণত হইতে পারে, এবং সুনিয়ন্ত্রিত আফগানিস্থান যাহাতে বৃটীশের বন্ধু হয়, তাহাই ইংরাজ রাজনীতিকদের তখন প্রধান কাম্য হইয়া উঠিয়াছিল।

সর্দ্দার আবদুর রহমান খান্ যখন কুন্দুজ নামক স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় ইংরাজদের পক্ষ হইতে গ্রীফিন সাহেব মৈত্রী জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাকে একখানি পত্র লিখেন এবং কাবুলে আসিয়া সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য আহ্বান করেন।

এদিকে সর্দ্দারগণও সমবেতভাবে আবদুর রহমান খান্‌কে আমীর বলিয়া গ্রহণ করিলেন; এবং তাহার পর হইতেই এই কূট-রাজনীতিবিদ্ আমীরের সু-শাসনেই বর্ত্তমান আফগানিস্থানের সকল সম্পদ ও সমৃদ্ধি সংঘটিত হইতে আরম্ভ হয়।

আমীর আবদুর রহমান খাঁ যখন আফগানিস্থানের আমীর হইয়া আসিলেন, তখন তাঁহাকে কখনও তাঁবুতে, কখনও কোনও প্রজার বাড়ীতে দিন কাটাইতে হইয়াছিল। আমীরের থাকিবার মত কোনও প্রাসাদ তখন ছিল না। এই ব্যাপার হইতে তখন আফগানিস্থানের অবস্থা কতদূর শোচনীয় ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়।

আবদুর রহমান খাঁ যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, রাজনৈতিক দিক দিয়া তখন আফগানিস্থান নানা খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছিল। প্রত্যেক খণ্ডেই একজন করিয়া সিংহাসন-লোভী সর্দ্দার ছিলেন। এই সমস্ত বিক্ষিপ্ত শক্তিগুলিকে সংহত করিয়া কঠোর হস্তে একটী কেন্দ্রীয় শাসনের অন্তর্ভুক্ত না করিতে পারিলে যে, আফগানিস্থানের মঙ্গল নাই, তাহা সর্ব্বপ্রথমেই তিনি বুঝিয়াছিলেন।

ভূতপূর্ব্ব বাদশাহ্দের দৌর্ব্বল্যেই এই সমস্ত বিক্ষিপ্ত শক্তিরা কেন্দ্রীভূত হইতে পারে নাই। সেইজন্যই আমীর আবদুর রহমান খান্কে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া কতকগুলি যুদ্ধ করিতে হয়; এবং তাহার ফলে তিনি সমগ্র আফগানিস্থানকে রাজনৈতিক দিক দিয়া এক শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন-যন্ত্রের পরিচালনে সংহত ও সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া তুলেন।

তাঁহার মৃত্যুর পরও যাহাতে তাঁহার আদর্শমত আফগানিস্থানের শাসনকার্য্য সুবন্দোবস্তের সহিত চলিতে পারে, সেই জন্য তিনি অতি কিশোরকাল হইতে দুই পুত্র হবিবুল্লাহ্ খান্

ও নাসিরুল্লাহ্ খান্‌কে তাঁহার আদর্শমত শিক্ষা দিতেন। এই দুই পুত্রকে সকল রকম রাজকার্য্যে সুদক্ষ করিয়া তুলিবার জন্য তিনি শেষ জীবনের সকল শক্তি নিয়োগ করেন।

আমীর আবদুর রহমানের মৃত্যুর পর আমীর হবিবুল্লাহ্ পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন এবং ধীরে ধীরে ইংরাজের সহিত তিনি প্রগাঢ় মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হইতে লাগিলেন।

ইংরাজের সহিত এই ঘনিষ্ঠতার ফলে কিন্তু আফগান জনসাধারণের মনে ক্রমশঃ আমীরের সম্বন্ধে নানা-প্রকারের সন্দেহ জাগিতে লাগিল। ১৯০৬ সালে তাঁহার ভারতে আগমন ও সেখানকার নানাপ্রকার খৃষ্টান প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযুক্ত হওয়ার ফলে তাহাদের এই সন্দেহ আরও দৃঢ়রূপ ধারণ করিতে থাকে।

এই সময় আফগান-সিংহাসনের পশ্চাতে আবার ষড়যন্ত্রের ধূমাগ্নি দেখা দিল। এই ষড়যন্ত্রের মূল-ইতিহাস জগতে আজও অজ্ঞাত! একদিন সকালবেলায় রাজপ্রাসাদের সম্মুখে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমীর হবিবুল্লাহ্‌র দেহরক্ষী সৈন্যরা সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইল। সিপাহ্‌সালার নাদের খান্ আসিয়া সৈন্যমণ্ডলী পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। আমীর আজ বিশ্রাম ও শীকারের জন্য লঘমানে যাইবেন। সরকারী নকিব আসিয়া চীৎকার করিয়া সকলকে জানাইল—"আল্ হজরৎ আমীর হবিবুল্লাহ্!"

বৃহৎ মোটর গাড়ী হইতে নামিয়া আমীর হবিবুল্লাহ্ সৈন্যমণ্ডলী পরিদর্শন করিলেন। তাহার পর মোটরে উঠিয়া কাবুল

পরিত্যাগ করিয়া গেলেন, কিন্তু তিনি আর কাবুলে ফিরিলেন না! ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারী রাত্রে জালালাবাদের নিকট গুপ্ত-ঘাতকের ছুরিকাঘাতে আমীর হবিবুল্লাহ্ দেহত্যাগ করিলেন।

প্রকৃতপক্ষে আফগান-অন্তর্বিপ্লবের পুনরুত্থান এইখান হইতে আবার শুরু হইল।

থল-বিজয়ী বীর সিপাহ্সালার নাদের খান্

যেদিন আমীর হবিবুল্লাহ্ খান্ নিহত হইলেন, সেদিন নাদের খান্ আফগান রাজ্যের প্রধান সেনাপতি। কিন্তু হবিবুল্লাহ্র আকস্মিক মৃত্যুতে নানাপ্রকারের জনরব জাগিয়া উঠিল। কেহ কেহ সন্দেহ করিল যে, নাসিরুল্লাহ্ খান্ প্রধান সেনাপতি নাদের খানের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া আমীরকে হত্যা করাইয়াছেন। সে যাহা হউক, জ্যেষ্ঠের মৃত্যুতে তিনি জালালাবাদে আপনাকে আমীর বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

এধারে হবিবুল্লাহ্র জ্যেষ্ঠ পুত্র আমানুল্লাহ্ খান্ কাবুলের সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। আমীর আমানুল্লাহ্ পিতৃব্য ও প্রধান সেনাপতিকে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত সন্দেহ করিয়া, সেনাদের লইয়া জালালাবাদে রওয়ানা হইলেন এবং নাসিরুল্লাহ্ খান্ ও নাদের খান্কে বন্দী করিয়া কাবুলে লইয়া আসিলেন।

বিচারে নাসিরুল্লাহ্ খান্ দোষী সাব্যস্ত হইয়া কারাগারে প্রেরিত হইলেন, কিন্তু প্রধান সেনাপতির বিরুদ্ধে সে রকম কোনও সাক্ষ্য না পাওয়ার দরুণ তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। অনেকেই মনে করেন যে, নাদের খান্‌কে মুক্তি দেওয়ার মধ্যে আমানুল্লাহ্‌র রাজনীতি ও স্বার্থবুদ্ধি লুক্কায়িত ছিল।

আমানুল্লাহ্ সেদিন যে নাদের খান্‌কে ক্ষমা করিয়াছিলেন, তাহার কারণ, তিনি জানিতেন যে, এই কূট রাজনীতিক ও যোদ্ধার প্রয়োজন তাঁহার একান্তভাবে আছে, এবং অচিরেই তাহা বোঝা যায়।

আমানুল্লাহ্ সেদিন নাদের খান্‌কে ক্ষমা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি আর প্রধান সেনাপতি রহিলেন না। তাঁহার পদচ্যুতি ঘটিল। অপেক্ষাকৃত নিম্ন পদের এক সেনাপতি করিয়া তাঁহাকে খোস্ত শহরে প্রেরণ করা হইল। এদিকে এই ঘটনার কিছুদিন পরেই আমীর আমানুল্লাহ্ ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন।

জাতির প্রয়োজনে সেদিন পদচ্যুত সেনা-নায়ক আবার স্বীয় শক্তির গৌরবে ইংরাজের বিরুদ্ধে আমীর আমানুল্লাহ্‌কে স্বাধীন আফগানিস্থানের বাদশাহ্ করিবার জন্য আগাইয়া আসিলেন। নাদির খানের অপূর্ব্ব রণকৌশলেই সেদিন ইংরাজ-বাহিনী থলের সমরক্ষেত্রে পরাজিত হইয়া আফগানিস্থানকে অন্যান্য রাষ্ট্রের মত স্বাধীন বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিল।

সেদিন য়ুরোপ ভ্রমণকালে বাদশাহ্ আমানুল্লাহ্ যে অভূত-পূর্ব্ব আতিথ্য পাইয়াছিলেন, তাহার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, এই থলের সমরক্ষেত্রে, এবং তাহাদের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন, সেনাপতি নাদের খান্।

এই পরাজয়ের পরে ইংলণ্ড ও আফগানিস্থানের মধ্যে এই সর্ব্বপ্রথম স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে উভয়ের সন্ধি হইল। কাবুলে যেমন বৃটীশ রাজদূত রহিল, তেমনি য়ুরোপের নানা রাজধানীতে আফগান রাজদূত নিযুক্ত হইল। পরিপূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে আফগানিস্থান জগতে স্বীকৃত হইল।

থল-বিজয়ের পুরস্কার-রূপে নাদের খান্ পুনরায় প্রধান-সেনাপতি হইলেন। কিন্তু কোনও অজ্ঞাত কারণে, অনেকে বলেন যে শারীরিক অসুস্থতার দরুণ, তিনি সে পদ ত্যাগ করেন।

অনেকে বলেন যে, আমানুল্লাহ্‌র শ্বশুর ও পররাষ্ট্রসচিব মাহ্‌মুদ বেগ তরজীর বিরুদ্ধতার দরুণই তিনি আফগান-রাষ্ট্রের সহিত সকল সম্পর্ক ত্যাগ করেন।

রাণী সুরাইয়ার পিতা জাতিতে একজন তুর্কী এবং তাঁহাদের বংশ পাশ্চাত্য শিক্ষায় দীক্ষিত। তিনি একজন সুলেখক এবং তুর্কী ভাষায় তাঁহার বহু উপন্যাসও আছে।

অনেকের ধারণা যে আমানুল্লাহ্ তাঁহার শ্বশুর ও তাঁহার শিষ্যদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হ'ন, এবং সেই কারণে কোনও রকম সংঘর্ষের হাত হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য

সিপাহ্‌সালার নাদের খান্‌ সেনাপতিত্ব পরিত্যাগ করিয়া প্যারিতে আফগান-রাজদূতের পদ লইয়া জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান।

নাদের খান্‌ যখন প্যারি শহরে আফগান-মন্ত্রী হইয়া যান, তখন মাহ্‌মুদ বেগ তরজী কাবুলে পররাষ্ট্র-সচিব ছিলেন। মাহ্‌মুদ বেগ এবং তাঁহার শিষ্যবর্গ নাদের খানের সম্বন্ধে নানা কুৎসা রটনা করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার শক্তির যে বিশেষ প্রয়োজন আছে, তাহা তাঁহারা অস্বীকার করিলেন ;—এমন কি নাদের খানের দেশ-প্রীতিতেও তাঁহাদের সন্দেহ ছিল !

মাহ্‌মুদ বেগ তরজী এবং তাঁহার শিষ্যগণ নাদের খান্‌কে আফগানিস্থানের পরম শত্রু পর্য্যন্ত মনে করিয়াছিলেন ; কারণ, তাঁহাদের ধারণায় নাদের খান্‌ সেকেলে এবং তাঁহাদের সংস্কার-কার্য্যে প্রধান অন্তরায় হইতে পারেন বলিয়া তাঁহারা আশঙ্কা করিয়াছিলেন।

নাদের খান্‌ কিন্তু মাহ্‌মুদ বেদ তরজীর দলকে ভাল রকমই জানিতেন। প্যারিতে মন্ত্রী হিসাবে তিনি খনির উদ্ধারের জন্য প্যারি হইতে কয়েকজন বিশেষজ্ঞ পাঠাইবার ব্যবস্থা করেন, কিন্তু মাহ্‌মুদ বেগের দল তাহাও প্রত্যাখ্যান করে।

অবশেষে তিনি সে পদও পরিত্যাগ করেন এবং প্যারিতে আপনার প্রবাস-ভবনে বসিয়া একজন সামান্য নাগরিকের মত তিনি স্বদেশের দিকে চাহিয়া দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

আমানুল্লাহ্—স্বদেশে ও বিদেশে

সিংহাসনে আরোহণ করিয়া আমানুল্লাহ্‌র অন্তরের সব চেয়ে বড় বাসনা ছিল, আফগানিস্থানকে বিংশ শতাব্দীর অন্যান্য শক্তিশালী রাষ্ট্রদের সমতুল্য করিয়া গড়িয়া তোলা। এই বাসনা তাঁহাকে উন্মাদনার মত পাইয়া বসিয়াছিল। তুরস্কের নব-জাগরণ ও বৈজ্ঞানিক তন্ত্রে নব দীক্ষা যে তাঁহার অন্তরে একটা অদূর সম্ভাবনার আশাও আনিয়া দেয় নাই—তাহাও নয়।

কিন্তু এই সংস্কারের উন্মাদনায় তিনি তাঁহার মধ্যে যে দূরদর্শী রাজনীতিকটী ছিল, তাহাকে হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, আফগান জাতিদের তিনি হৃদয় দিয়া জয় করিয়া লইবেন, এবং তাহারা তাঁহার আজ্ঞা বন্ধুর নিবেদনের মত মানিয়া চলিবে।

তাই আমীর আমানুল্লাহ্ তাঁহার রাজত্বের প্রারম্ভে সিংহাসন হইতে নামিয়া আসিয়া সাধারণ নাগরিকদের মত সাধারণের অন্তরে প্রবেশ-পথের অনুসন্ধানে বাহির হন। রাজার সকল অহমিকা, জাকজমক পরিত্যাগ করিয়া তিনি একজন সাধারণ আফগান নাগরিকদের মত আপনার হৃদয়ের সকল দ্বার খুলিয়া সবার সহিত সমান হইয়া মিশিতে আসিলেন। ইস্‌লামের ও আফগান জাতির একজন সামান্যতম দীন সেবক ব্যতীত

আর কোনও গর্ব্ব-বাণী ইংরাজ-বিজয়ী বীরের মুখ হইতে বাহির হয় নাই।

বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও কল-কারখানার পরিচালন-ব্যাপারে আফগানিস্থান তখন বহু পশ্চাতে পড়িয়াছিল।

আমানুল্লাহ্ বুঝিয়াছিলেন যে, জাতির অর্থনৈতিক ভিত্তিকে সুদৃঢ় করিয়া গড়িতে না পারিলে, তাহার রাজনৈতিক অস্তিত্ব বজায় রাখা বিংশ শতাব্দীতে দুরূহ হইয়া উঠিবে। বাহিরের বণিকদের হাতে ধীরে ধীরে আফগান-শাসনের মাপকাঠি গিয়া পড়িবে। শিল্প ও বাণিজ্যের আভ্যন্তরীণ উন্নতি ব্যতিরেকে এই সকল দ্রব্যের জন্য আফগানদের বাণিজ্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইবে এবং এই অর্থনৈতিক নির্ভরতা জাতির স্বাতন্ত্র্যরক্ষার প্রধানতম অন্তরায়।

ইহা উপলব্ধি করিয়া আমানুল্লাহ্ এক দিকে বিজ্ঞানচর্চ্চার জন্য আফগান যুবকদের যেমন য়ুরোপে পাঠাইলেন, অন্য দিকেও তেমনি দেশের অভ্যন্তরে নানা প্রকারের কল-কারখানা ও শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে লাগিলেন।

১৯২৮ সালের প্রারম্ভে বাদ্‌শাহ্ আমানুল্লাহ্ য়ুরোপ-ভ্রমণে বাহির হন। আমানুল্লাহ্ এই য়ুরোপ-ভ্রমণ বর্ত্তমান জগতের ইতিহাসে অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্মরণীয় ঘটনা। এই আদর্শবাদী নৃপতি জগতের সকল জাতির জনসাধারণের মনে যে গভীর শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত, তাহা তাঁহার ভ্রমণকালে বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়।

আমানুল্লাহ্ যেখান দিয়া গিয়াছেন, সেইখানকার সকল অধিবাসীর হৃদয় জয় করিয়া গিয়াছেন। জগতের বড় বড় রাষ্ট্র তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্রত্যেকের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ;—কিন্তু সে সকলের বাহিরে একটী ঘটনা বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার আছে যে, তিনি যে-দেশ দিয়া গিয়াছেন, সেই দেশেরই জনসাধারণ তাঁহাকে তাহাদের অন্তরের অযাচিত শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছে। তাহার কারণ কোথায় ?

এই বিংশ শতাব্দীর যন্ত্র-চালিত যুগে আমানুল্লাহ্ তাঁহার চরিত্রের সঙ্গে অতীত যুগের আদর্শ নৃপতিদের আব-হাওয়া লইয়া আসিয়াছিলেন। যে-রাজা প্রজার কল্যাণের জন্য নিশীথে ছদ্মবেশে প্রজার ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়ায়, যে-রাজা সিংহাসনের আড়ালে জনতার চোখে অদৃশ্য হইয়া থাকে না, রাজা হইয়াও যে সামান্য নাগরিক, সবার মতন সবার সাথে চলে, সে রাজা যে সকল দেশের জনতার হৃদয়ে স্থান পাইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

তাহার উপর, ইংরাজের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া বিজয়ীর গর্ব্ব অনুভব করিয়াছেন, এই শতাব্দীতে একমাত্র আমীর আমানুল্লাহ্। তাঁহার অসামান্য শৌর্য্যবলে তিনি এক মুহূর্ত্তে জগতের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন এবং তিনি রাজার মত সে সম্মান গ্রহণ করিতেও জানিতেন। তাঁহার অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে হৃত-সর্ব্বস্ব এশিয়ার প্রাণে এক নূতন আশার স্পন্দন জাগে ;—তাই যেদিন চমনের গিরিপথ অতিক্রম করিয়া তাঁহাকে তাঁহার প্রিয়

জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হয়, সেই সময় সত্যই বহু লোক অশ্রু-বিসর্জ্জন করিয়াছিল।

১৯২৮ সালের প্রারম্ভে বেগম সুরাইয়্যাকে সঙ্গে লইয়া তিনি ভারত হইয়া য়ুরোপ-পরিভ্রমণে বাহির হন। এত ব্যাপক ও এত বিপুলভাবে এবং এত বিভিন্ন জাতির দ্বারা এ রকম অভিনন্দন জগতের আর কোনও রাজা কখনও পান নাই। এই য়ুরোপ-ভ্রমণকালে জগতের সকল ভাষার সকল কাগজ শুধু সংখ্যার পর সংখ্যা ভ্রমণ-কাহিনীর বৃত্তান্ত ছাপিয়াছে। জগতের সকলের দৃষ্টি একসঙ্গে আফগানিস্থানের উপর আসিয়া পড়িল। য়ুরোপের প্রত্যেক রাষ্ট্র তাঁহার বিশেষ সহানুভূতি পাইবার জন্য অভ্যর্থনায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা লাগাইয়া দিল।

আমানুল্লাহ্ স্বদেশে যে অর্থনৈতিক সংস্কারের চেষ্টা করিতে-ছিলেন, তাহাতে বিদেশীর বিজ্ঞানশক্তির প্রয়োজন ছিল। কোন্ জাতি হইতে সেই প্রয়োজনের মাল-মশলা সংগ্রহ করা হইবে, তাহা কেহই জানিত না। সেইজন্য সকল রাষ্ট্রই চেষ্টা করিতে লাগিল, যাহাতে তাহাদের লোক এবং জিনিষ আফগানিস্থানে স্থান পায় এবং আফগানিস্থানের ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য সকলেই এই ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্প্রীতির বন্ধন দৃঢ় করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু আমানুল্লাহ্ এই দীর্ঘ ভ্রমণকালে যে অভূতপূর্ব্ব সম্মান সম্পূর্ণ অযাচিতভাবে পান, তাহা তিনি আফগান জাতির গৌরবকে কোথাও বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ না করিয়া, বরঞ্চ তাহা বহু অংশে বৃদ্ধি করাইয়াই গ্রহণ করেন।

আমানুল্লাহ্ ও শিনোয়ারী আন্দোলন

২৬শে জুন, ১৯২৮ সাল—আমানুল্লাহ্ যখন দেশে ফিরিয়া আসিলেন, জাতির সকল প্রতিনিধিদের ডাকিয়া যখন জানাইলেন যে, তাঁহাদের কল্যাণের জন্যই তিনি য়ুরোপ প্রবাসে গিয়াছিলেন,—তখন তিনি বিন্দুমাত্র সন্দেহ করেন নাই যে, যে-জাতিকে তিনি হৃদয় রিক্ত করিয়া জয় করিয়াছিলেন, তাহার পরিবর্ত্তে এক সন্দিগ্ধ জাতি তাঁহার কথা শুনিতেছে।

প্রেমের যে ক্ষেত্র তিনি তৈয়ারী করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন, ভাবিয়াছিলেন, তাহাতে বীজ ফেলিলেই অঙ্কুর দেখা দিবে;—হতভাগ্য আমানুল্লাহ্ জানিতেন না যে, তিনি লুপ্তবালুকায় বীজ বপন করিতেছেন! তাই সহসা যখন বিদ্রোহ জাগিয়া উঠিল, বোধ হয়, জগতের মধ্যে সব চেয়ে বিস্মিত হইয়াছিলেন, স্বয়ং আমানুল্লাহ্।

অনেকে মনে করেন যে, এই বিপ্লবের অসন্তোষের মূলে বাহির হইতে ইন্ধন দেওয়া হইয়াছে। একে তো আফগানীরা একান্ত ধর্ম্মবিশ্বাসী এবং বিচার-বিতর্কহীন,—তাহার উপর উপযুক্ত অবসরও মিলিল। বেগম সুরাইয়া পর্দ্দামুক্ত হইয়া য়ুরোপের নানা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করিয়াছেন, প্রকাশ্য ভোজসভায় পর্দ্দামুক্ত হইয়া য়ুরোপীয় নারীদের মতই

ব্যবহার করিয়াছেন। এই সংবাদ আফগান-জনতার নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া যাহাদের দরকার, তাহারা বেশ ভালভাবে এই সংবাদটীকে রঙচঙ দিয়া ধর্ম্মের অনুশাসনের সঙ্গে জুড়িয়া আফ-গানদের নিকট পৌঁছাইয়াছিল। আমানুল্লাহ্‌কে ইস্‌লামদ্রোহী প্রতিপন্ন করিবার জন্য একটা তুমুল ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি হয়!

পার্শ্বচর বন্ধুদের উৎসাহে উৎসাহিত ও য়ুরোপের রূপে মুগ্ধ হইয়া রাজ-দম্পতি যখন স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন আমানুল্লাহ্ ভাবিতে পারেন নাই যে, যে আদর্শ তিনি প্রচার করিতে যাইবেন, সেই আদর্শের বিরুদ্ধে জনমত একেবারে তৈয়ারী হইয়া আছে।

জনতার মনে তখন যেটুকু সন্দেহ ছিল, তাহা আমানুল্লাহ্‌র সংস্কার-প্রবর্ত্তনের নূতন ধারা দেখিয়া স্পষ্টই দূর হইয়া গেল। আমানুল্লাহ্ অবশ্য এমন কিছুই করেন নাই, যাহার জন্য তাঁহাকে এই মহা-প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইল;—কিন্তু অজ্ঞ জনতাকে লইয়া যাহাদের চলিতে হয়, তাহাদের জনতাকে মাঝে মাঝে মাপিয়া দেখিতেও হয়।

আমানুল্লাহ্ চাহিলেন, একদিনে কাবুলকে য়ুরোপের অন্যান্য নগরীর মত গড়িয়া তুলিতে। রাজকর্ম্মচারীদের য়ুরোপীয় পোষাক আইনমত প্রচলন করিলেন, শুক্রবার ছুটির দিন, তাহা বন্ধ করিয়া য়ুরোপীয় পদ্ধতি অনুসারে রবিবার ছুটির দিন ধার্য্য করিলেন। এই সমস্ত বাহিরের পরিবর্ত্তন অতি সামান্য; কিন্তু জাতির মনস্তত্ত্ব যাঁহারা জানেন, তাঁহারা বলিবেন

যে এই সমস্ত সামান্য ব্যবহারিক পরিবর্ত্তনই জাতিকে বেশী করিয়া নাড়া দেয়।

কেন না, বাহিরের এই সমস্ত ছোটখাটো অনুষ্ঠান, এই প্রতিদিনের পোষাকের সহিত জাতির অনাদিকালের স্মৃতি ও সঙ্গ বিজড়িত। প্রত্যেক জাতির এমন কতকগুলি ছোট ছোট জিনিষ আছে, যাহার কোনও রকম পরিবর্ত্তন করা মানে, একেবারে জাতির মনস্তত্ত্ব পরিবর্ত্তন করা; এবং জাতির মনস্তত্ত্ব পরিবর্ত্তন না করিয়া সেগুলির পরিবর্ত্তন করিতে যাওয়ার মানে, বিপ্লবকে আহ্বান করিয়া আনা।

সহসা ১৯২৮ সালে নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি আফগানিস্থানে শিনোয়ারী* বিপ্লব দেখা দিল। কিন্তু আমানুল্লাহ্ কোনও দিন কোনও বিপ্লবের সম্ভাবনার কথা ভাবিতে পারেন নাই। আফগানদের রক্তপাত করিয়া আফগানিস্থানের সিংহাসন যে তাঁহাকে বজায় রাখিতে হইবে, এ কথা তাঁহার মনের কোণে কোথাও ছিল না। বাদশাহ্ আমানুল্লাহ্ প্রত্যেক আফগানের এক বিন্দু শোণিতকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করিতেন এবং শিনোয়ারী বিপ্লবের সময় তাঁহার কার্য্যকলাপ দেখিয়া সেই কথা স্পষ্টই প্রমাণ হইয়া গিয়াছে।

বিপ্লবের প্রথম অবস্থায় আমানুল্লাহ্ অনায়াসে রূঢ় হস্তে বিদ্রোহ দমন করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা তাঁহার রাজ-ধর্ম্মে

*আফগানিস্থানের মোল্লা-সম্প্রদায়ের যে অংশ, সকল পাশ্চাত্য আদর্শের অনুকরণের বিরুদ্ধে আফগান জনসাধারণকে উত্তেজিত করিয়াছিল।

ব্যাঘাত লাগে। তাঁহার রাজ-ধর্ম্মে একটী প্রজারও জীবন-নাশ করা পাপ বলিয়া গণ্য ছিল—তাই তিনি নানাপ্রকারে, এমন কি আপনার সম্মান পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়া শান্তভাবে এই বিদ্রোহ প্রশমিত করিতে চাহিয়াছিলেন।

কিন্তু আমানুল্লাহ্‌র চরম দুর্ভাগ্য যে, তাঁহার এই শান্তি-প্রচেষ্টাকে জগৎ রাজকীয় দুর্ব্বলতা বলিয়া জানিল ;—এবং তাঁহার এই স্বদেশবাসীরাই ইহার ষোলো আনা সুবিধা এমন ভাবে গ্রহণ করিল যে, যখন বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য বাধ্য হইয়া অস্ত্র ধরিতে হইল, তখন বিদ্রোহের শক্তি প্রচুর বাড়িয়া গিয়াছে !

ত্রিশ হাজার শিনোয়ারী সৈন্য সহসা পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে নামিয়া প্রথমে ডক্‌কা গ্রাম ধ্বংস করিয়া দিয়া জালালাবাদের দিকে রওয়ানা হয়। জালালাবাদের প্রবেশ-পথে কিছুদিন ধরিয়া সংঘর্ষ চলিতে থাকে। তারপর সহসা বিপ্লবীরা পাহাড়ের মধ্য হইতে যেমন অতর্কিতভাবে আসে, তেমনি অতর্কিতভাবে অদৃশ্য হইয়া যায়।

সেদিন জালালাবাদের রাজপ্রাসাদে উৎসব চলিতেছিল। সহসা রাত্রে বিপ্লবীরা রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করিল এবং রাজ-প্রাসাদের চারিদিকে আগুন ধরাইয়া দিল। গুপ্ত পথ দিয়া যে পারিল পলাইল।

এদিকে শিনোয়ারীরা ক্রমশঃ কাবুলের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। এই বিপ্লবের সংবাদে কাবুলে ভীষণ গণ্ডগোল

উপস্থিত হইল। আমানুল্লাহ্ সৈন্য না পাঠাইয়া এই বিদ্রোহী-দের নিকট তাঁহার ফার্ম্মাণ পাঠাইতে লাগিলেন এবং এই সমস্ত ফার্ম্মাণে তিনি একান্ত নম্রভাবে তাঁহার সকল আদর্শের কথা খুলিয়া বলেন, এবং অকারণে যুদ্ধে যোগ দিয়া মুসলমানের রক্তপাত করিতে অনিচ্ছুক, তাহা জানান। কিন্তু তাহাতে কোনই ফল হইল না!

সেই সময় সহসা ভয়ানক শীত নামিয়া আসিল। পথঘাট সমস্ত বরফে বন্ধ হইয়া গেল। কিছুদিনের মত বিপ্লব প্রশমিত রহিল এবং শিনোয়ারীদের সহিত তাঁহার সন্ধির আলোচনা চলিতে লাগিল। কিন্তু শীত শেষ হইতে না হইতেই সহসা আবার শিনোয়ারীদের অভিযান আরম্ভ হইল।

এই সময় আর একটী ঘটনা ঘটিল! আফগানিস্থানের পার্ব্বত্য প্রদেশে এক দস্যু থাকিত। এত দুরধিগম্য সে স্থান, যে, সেখানে সচরাচর কেহই যাইত না। এই দস্যুকে ধরিবার জন্য বহু বার সৈন্য পাঠান হইয়াছে, কিন্তু তাহারা দস্যুর কোন সন্ধান করিতে পারে নাই। সেই দস্যুর কার্য্যবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য সৈন্যদল সেই পাহাড়ের রক্ষণাবেক্ষণ করিত। রাজধানীতে সৈন্যের প্রয়োজন হওয়ায় বাদশাহ্ সেই সৈন্যদলকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

ভিস্তীর ছেলে বলিয়া সেই দস্যুর নাম ছিল বাচ্চাইসাক্কা। জগতে তখন উহাই ছিল, তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদবী। কেহ তখন জানিত না, ভাবিতেও পারে নাই, যে, এই দস্যু তাহার জন্ম-

পদবীতে সন্তুষ্ট ছিল না। গোপনে সে বাদশাহী পদবী ও ঐশ্বর্য্যের মধ্যে তাহার জন্মকাহিনীকে বিলুপ্ত করিয়া দিবার অসম্ভব বাসনা যে, অন্তরে পুষিতেছিল, তাহা কেহই তখন জানিত না।

ইতিমধ্যে আমীর আমান্নুল্লাহ্ পুনরায় শিনোয়ারীদের সহিত সন্ধির শর্ত্তের আলোচনা করিতে লাগিলেন। অকারণ রক্তপাত বন্ধ করিবার জন্য অবশেষে তিনি শিনোয়ারীদের প্রস্তাবিত সন্ধিতে সম্মতি দিতে প্রস্তুত হইলেন। এমন সময় সংবাদ আসিল যে, বিপুল সৈন্যদল লইয়া বাচ্চাইসাক্কা আসিতেছে, কাবুলের দিকে, কাবুলের সিংহাসনের দিকে—আপনার জন্ম-গ্লানি মুছিয়া ফেলিয়া বাদশাহ্‌র পদবী গ্রহণ করিতে!

বাচ্চাইসাক্কা নিজের সেই বিপুল সৈন্যদল লইয়া শিনোয়ারী-দের সহিত যোগদান করে এবং আপনার দল বৃদ্ধি করিয়া সহসা কাবুল আক্রমণ করে। তিন চারিদিন ধরিয়া ক্রমাগত গুলি চলিতে লাগিল, এবং এমন কি, বিদেশী লিগেশনের মধ্য হইতেও কেহ বাহির হইতে পারিল না।

বাচ্চাইসাক্কা কাবুলের উপান্তবর্ত্তী বারুদখানাও দখল করিয়া লইল। একটী রীতিমত জমকালো পোষাক পরিয়া, মাথায় পাখীর নানা-রঙের পালকের টুপী দিয়া বাচ্চাইসাক্কা সেখান হইতে আপনাকে কাবুলের রাজা বলিয়া ঘোষণা করিল।

বাচ্চাইসাক্কা যখন ক্রমশঃ বৃটীশ লিগেশনের নিকটে আগাইয়া আসিতেছিল, তখন বৃটীশ লিগেশনের পক্ষ হইতে

ইংরাজ-মন্ত্রী বাচ্চাইসাক্কাকে জানাইয়া দিলেন যে, 'লিগেশনের অভ্যন্তরে তাহার দল যেন কোনও ক্ষতি না করে। বাচ্চাইসাক্কা বৃটীশ মন্ত্রীর কথায় রাজী হইয়া লিগেশনের পথে তাহার নিজের প্রহরী বসাইল!

মানবপ্রেমিক আমানুল্লাহ্

এদিকে দলে দলে লোক রাজপ্রাসাদে সৈন্য হইবার জন্য আসিতে লাগিল। কিন্তু আবশ্যকীয় টোটা সংগ্রহ করিয়া যে যাহার ঘরে আত্মরক্ষার জন্য পলাইয়া গেল;—কেহ কেহ গিয়া বাচ্চার দলে যোগদান করিল!

যে সমস্ত বন্ধুর সহায়ের উপর তিনি এতকাল নির্ভর করিয়াছিলেন, তাহারাও পার্শ্ব হইতে সরিয়া পড়িল। একা এই নিদারুণ অবস্থায় আমানুল্লাহ্ বন্দুক-হস্তে স্বয়ং রাস্তায় বাহির হইয়া পড়েন;—এবং তাঁহাকে সেই অবস্থায় দেখিয়া লোকে পুনরায় তাঁহার পতাকার তলে সমবেত হইতে থাকে।

কাবুলের প্রবেশ-পথের সম্মুখে এক প্রান্তর। প্রান্তরের এপারে কাবুলের প্রবেশ-পথে বাদশাহী গোলন্দাজ সৈন্য; ওপারে বাচ্চাইসাক্কার দল। সেই মুক্ত প্রান্তরের মধ্য দিয়া গোলার মুখে পড়া বিপজ্জনক। কয়েক দিন ধরিয়া ক্রমান্বয়ে এখানে যুদ্ধ চলিতে লাগিল।

এধারে কাবুল-অধিবাসীরা আমানুল্লাহ্‌কে কাবুলের সিংহাসন ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিতে লাগিল। তাঁহারই জন্য অকারণ রক্তপাত হইতেছে ভাবিয়া, আমানুল্লাহ্‌ ঠিক করিলেন যে, তিনি কাবুলের সিংহাসন ত্যাগ করিবেন—জাতির অকারণ বলক্ষয় নিবারিত হউক।

আমানুল্লাহ্‌ কাবুলের সিংহাসন ত্যাগ করিয়া কান্দাহারে চলিয়া আসেন এবং তাহার কিছুদিন পরেই কান্দাহার হইতে তিনি ভারতে আসেন। সমগ্র জগৎ বিস্ময়ে এই ঘটনার দিকে ফিরিয়া চাহিল।

অনেকে আমানুল্লাহ্‌কে অনেক ভাবে বিচার করিলেন। কেহ বলিলেন, কাপুরুষ, অরাজকত্বের মধ্যে দেশকে ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া আসাতে, তিনি রাজার কর্ত্তব্য পালন করেন নাই। কেহ বলিলেন, তিনি অপরিণামদর্শিতার ফলভোগ করিলেন। আমানুল্লাহ্‌র এই সিংহাসনত্যাগের ব্যাপারে অনেকে দুঃখ-প্রকাশও করিলেন; এবং তাঁহারা মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইলেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রে ইহার একটা মীমাংসা করা তাঁহার উচিত ছিল।

কিন্তু ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক, যখন সমগ্র জগতের কর্ম্ম ও চিন্তা একত্র করিয়া, সাময়িক স্বার্থ ও প্রয়োজনীয়তাবাদ হইতে দূরে থাকিয়া এই সমস্ত ঘটনার কাহিনী লিখিবেন, তখন আজি-কার শতাব্দীর বহু ঘটনা হয়ত তাঁহার চোখে পড়িবে না।

আমানুল্লাহ্‌র এই সিংহাসন-ত্যাগ এবং তাহার পিছনে মানবপ্রেমিকতার যে মহান্‌ আদর্শ আছে, তাহা সাময়িক

উত্তেজনার মুখে ধরা না পড়িলেও সময়ের পারিপার্শ্বিকতায় তাহা যখন ফুটিয়া উঠিবে, মানব তখন শ্রদ্ধায় তাঁহাকে স্মরণ করিবে, রাজা বলিয়া নয়, একজন সত্যিকারের মানব বলিয়া।

তাঁহার অতীত ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, একজন পুরামাত্রায় আদর্শবাদী মানব হইয়াই তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ; আহারে, বিহারে, সর্ব্বদাই তিনি ভুলিতে চেষ্টা করিতেন যে, তিনি রাজা !

বহুদিন, না জানাইয়া সহসা কোনও সামান্য সরাইখানাতে গিয়া খাইতে বসিয়া যাইতেন। সরাইওয়ালা স্তম্ভিত হইয়া যাইত। কোনও বিশেষ খাদ্য প্রস্তুত করিয়া দিতে চাহিলে, বারণ করিতেন। যাহা তৈয়ারী থাকিত, তাহাই খাইয়া চলিয়া আসিতেন। এই সমস্ত হোটেলে খাইয়া বিদেশী পর্য্যটকগণ পর্য্যন্ত নাক শিট্‌কাইয়া চলিয়া গিয়াছেন···তিনি কিন্তু সানন্দে তাহা গ্রহণ করিতেন।

সাধারণ জীবনের সঙ্গে তাঁহাকে যে চেষ্টা করিয়া আপনাকে মিশাইয়া দিতে হইত, তাহা নয়, তিনি সহজ ভাবেই জনতার সহিত মিশিয়া যাইতেন।

একদিন সহসা পথে তাঁহার মোটর গাড়ীর চাকা ফুটা হইয়া যায়। চালকের সুবিধার জন্য তিনি তৎক্ষণাৎ মোটর হইতে পথে নামিয়া দাঁড়াইলেন। সেইখান দিয়া তখন একটী টোঙ্গা যাইতেছিল। টোঙ্গা দেখিয়া সহাস্যবদনে টোঙ্গাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমাকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিবে ?"

টোঙ্গাওয়ালা বিস্মিত হইয়া বলিল—"যদি দরিদ্র টোঙ্গা-ওয়ালাকে কিছু সাহায্য করেন।"

কোনও দ্বিরুক্তি না করিয়া তিনি টোঙ্গায় বসিলেন। টোঙ্গায় উঠিয়া তিনি লোকটীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন ; টোঙ্গার অবস্থা দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন— "টোঙ্গা মেরামত করিয়া ভাল অবস্থায় রাখ না কেন ?"

টোঙ্গাওয়ালা উত্তর দিল—"তুই বন্ধুতে মিলিয়া, যাহা কিছু ছিল, তাহা দিয়া এই টোঙ্গা কিনিয়াছিলাম। কিন্তু ট্যাক্সী হওয়ার দরুণ আমাদের উপায় কমিয়া গিয়াছে। টোঙ্গা থেকে এমন কিছু আয় হয় না, যাহাতে খাওয়া-পরা বাদে মেরামতের জন্য কিছু রাখি।"

প্রাসাদে আসিয়া আমানুল্লাহ্ তাঁহার মোটর-চালককে তাঁহার পুরানো ডজ গাড়ীটা বাহির করিতে বলিলেন এবং গাড়ীটা বাহির করানো হইলে, তিনি তাহা টোঙ্গাওয়ালাকে দান করেন। দিবার সময় শুধু বলিলেন—"কিন্তু একটা কথা, গাড়ী শুধু তোমার একলার নয়, তোমার সেই বন্ধুটীরও অংশ ইহাতে রহিল। এই গাড়ী তোমার একলার সম্পত্তি করিয়া লইয়া যেন ঈমান হারাইও না।"

কত দিন কত রাত্রে কাবুলের দরিদ্র পল্লীতে ছদ্মবেশে আমানুল্লাহ্ পকেটে অজস্র মুদ্রা লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন। কত অনাথ পরিবার, কত অসহায় ব্যক্তি, তাঁহার নিকট হইতে

সাহায্য পাইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। তবে কেহই সহায়-কর্ত্তার নাম জানিত না!

আমানুল্লাহ্‌র চরিত্রের এইখানে আর একটী দিক বিশেষ-ভাবে স্মরণে রাখিতে হইবে।

আফগানিস্থানের ইতিহাসের পিছনের দিকে চাহিয়া তাঁহার আদর্শ-বাদী মন দেখিতে পাইয়াছিল যে, এই সিংহাসনকে ঘিরিয়া ধারাবাহিক ভাবে কি ভয়াবহ রক্তপাতই না হইয়া আসিয়াছে। রাজার পর রাজা, ভাইএর পর ভাই, বন্ধুর পর বন্ধু এই সিংহাসনকে উপলক্ষ করিয়া নিজেদের ও জাতির কি ভয়াবহ রক্ত-ক্ষয় করিয়া আসিয়াছে। তিনি নিজেও যখন সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন, তখনও তাঁহার পিতার রক্ত তাহার গায়ে লাগিয়াছিল।

এই সমস্ত দেখিয়া তাঁহার মনে এই ধারণা জন্মে যে, তাঁহার জন্য যেন কোনও দিন আর এই সিংহাসনকে উপলক্ষ করিয়া অকারণ রক্তক্ষয় না হয়। এই আদর্শ তাঁহার এবং তাঁহার ভ্রাতার মনে এতদূর প্রতিষ্ঠিত ছিল যে, যখন তাঁহারা দেখিলেন যে, তাঁহাদের জন্যই সিংহাসনকে ঘিরিয়া আবার রক্ত-স্রোত বহিয়া চলিতেছে, তখনই তাঁহারা দুইজনে সিংহাসন হইতে সরিয়া দাঁড়াইলেন।

কাবুল হইতে কান্দাহারে চলিয়া আসিয়া আমানুল্লাহ্‌ একটী ইস্তাহার জারী করেন। তাহাতে সেই-সময়কার অবস্থা বিশেষ ভাবে বোঝা যায়। বিবৃতিতে বলা হইয়াছে—

"দক্ষিণ প্রদেশের অধিবাসী আমার প্রিয় সন্তানগণের প্রতি,

"পূর্ব্ব প্রদেশে প্রথমে আভ্যন্তরীণ হাঙ্গামা দেখা দেয়। সেই হাঙ্গামার মীমাংসা না হইতেই উত্তরাঞ্চল হইতে একদল লোক অকস্মাৎ কাবুলে হানা দেয়। আফগানিস্থানের উন্নতি-বিরোধী শত্রুদের ষড়যন্ত্রেই এই সমস্ত আভ্যন্তরীণ হাঙ্গামা উপস্থিত হয়। ইহা দ্বারা জনসাধারণ এবং অজ্ঞ লোককে আমার সম্বন্ধে অকারণ সন্দিগ্ধ করিয়া তোলা হইয়াছে।

"আমি তাহাদিগকে পিতার মত উপদেশ দিয়াছিলাম। কিন্তু অনিষ্টকারীর চক্রান্ত এবং লোকের অজ্ঞতা মিলিয়া অসন্তোষের অগ্নিকে দিন দিন প্রবলতর করিয়া তুলিতে লাগিল। আমার জন্য মুসলমানেরা কলহ করুক, এই ইচ্ছা আমার কোনও দিন ছিল না। আমার জন্য মুসলমানেরা পরস্পর যুদ্ধ করিবে, নিহত হইবে, ইহা আমি চাই না। শত্রুর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য যে শক্তি সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা আত্মকলহে নিঃশেষিত হইবে, ইহা আমি কিছুতেই চাহি না।

"দেশের ও জাতির মঙ্গল-কামনাতেই আমি এই গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলাম; আমি কোনও দিন আমার সিংহাসন-অধিকারে কোনও গুরুত্ব দিই নাই। কাজেই আমি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে সাধারণের শান্তির জন্য সিংহাসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনি প্রথমে স্বীকৃত হইতে চান নাই। কিন্তু পরে আমার একান্ত অনুরোধে তিনি সম্মত হন। কাবুলের অধিবাসীরাও তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করে।

তাহারা মনে করিয়াছিল যে, আমি কাবুল ত্যাগ করিয়া গেলেই গৃহবিপ্লবের অবসান হইবে।

"আমি কান্দাহারে চলিয়া আসিলাম। এখানকার অধি-বাসীদের সকল কথা বুঝাইয়া বলিলাম। তাহারা আমার কথা শুনিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল, এবং বলিল যে, তাহারা আমাকে ভিন্ন আর কাহাকেও বাদশাহ্ বলিয়া স্বীকার করিবে না।

"কাবুলের অবস্থা অবগত হইবার জন্য আমি ব্যস্ত ছিলাম। আমি জানিতে পারিলাম যে, আমার বিরুদ্ধে যে আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল, ব্যাপার তাহাতেই শেষ হয় নাই। শত্রুদের চক্রান্তে আমাদের ঐক্য বিনষ্ট করার চেষ্টা হইতেছে। ফলে আগুন নিভিল না। অনিষ্টকারীর দল আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারও বিরুদ্ধে লাগিল।

"তিনিও কান্দাহারে চলিয়া আসিলেন। পুনরায় কান্দাহার-বাসীদের সহিত আলোচনা হইল। আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিলেন —'আমাকে সিংহাসনের দায়িত্ব হইতে মুক্তি দাও। আমার কোনও দিন সিংহাসনের উপর লোভ ছিল না, এখনও নাই।'

"কান্দাহারের সকল লোক আমার নিকট আসিয়া বলিল যে, যতদিন পর্য্যন্ত একজনও কান্দাহারী জীবিত থাকিবে, ততদিন আমি যেন আফগানিস্থানের মুসলমানদের রাজত্ব ত্যাগ না করি। তাহারা বলে যে, বাচ্চাইসাক্কা নরঘাতক দস্যু··· সে আফগান-বংশ-সম্ভূত নয়···তাহার মত লোকের বশ্যতা স্বীকার করা আফগানদের আত্মসম্মানের বিরোধী।

"দক্ষিণ প্রদেশের অধিবাসী হে আমার প্রিয় সন্তানগণ, আমি এই ফার্ম্মান দ্বারা এই কথা তোমাদিগকে জানাইতেছি যে, এই হীন অন্ত্যজকে সিংহাসনে বসিতে দেখিয়া নিশ্চয়ই তোমাদের রক্ত গরম হইয়া উঠিবে, এ কথা আমি জানি। তোমাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক কলহ বিদ্যমান আছে, তাহাও আমি জানি। কিন্তু আজ জাতির সঙ্কটকাল উপস্থিত। সুতরাং এ সময় দেশসেবার জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়া দরকার। প্রার্থনা করি যে, খোদা আমাদিগকে এরূপ সাহায্য করেন, যাহাতে আমাদের ও আফগান জাতির শত্রুর উদ্দেশ্য সফল না হয়।"

বাচ্চাই-সাক্কার বাদশাহী

এতদিন পার্ব্বত্য জঙ্গলে থাকিয়া অসতর্ক গৃহস্থের ধন ও প্রাণ লুণ্ঠন করিয়া যে ব্যক্তি আপনার জীবিকা উপার্জ্জন করিত, দুঃসাহস ও সময়-গতিকে সে দেখিল যে, সে অনায়াসে কাবুলের রাজপ্রাসাদে বসিয়া আছে।

ভিস্তীর ঘরে জন্মিয়াছিল বলিয়া তাহাকে লোকে এখনও সেই ভাবে জানে। কিন্তু এই রাজপ্রাসাদের মধ্যে সে নাম তো আর চলে না। সুতরাং বাচ্চাই-সাক্কা হইলেন, গাজী হবিবুল্লাহ্ খান্।

কিন্তু নাম বদলাইলেই মন বদলায় না, সিংহাসনে বসাইয়া দিলেই লোকে রাজার শক্তি ও ঐশ্বর্য্য পায় না। খোস্তের

পার্ব্বত্য-প্রদেশে যে দস্যু একাকী ঘুরিয়া বেড়াইত, সৈন্য-সামন্ত লইয়া সেই দস্যুই কাবুলে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

আফগান আভিজাত্য তাহার বাদশাহী শাসনে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল এবং এই সমগ্র বিপ্লবের মধ্যে যেখানে একটীও শ্রেষ্ঠ আফগানের জীবন-নাশ হয় নাই, সেখানে বাচ্চাই-সাক্কার বাদশাহী শাসনে অতি অল্পদিনের মধ্যে আফগান জাতির অনেকগুলি প্রফুল্ল প্রস্থন অকালে অতি নির্ম্মম ভাবে বিনষ্ট হইয়া যায়! এত বড় ক্রূর বীভৎসতা ও অপ্রয়োজনীয় নিষ্ঠুরতা দস্যুর দ্বারাই সম্ভব। প্রাসাদস্থিত সমস্ত আফগান যুবরাজ-দিগকে বাচ্চা আর্গ দুর্গে আবদ্ধ করিয়া রাখে। সেইখানেই সেই অন্ধকার কারাগারে তাঁহাদের অনেকের জীবনলীলা সাঙ্গ হইয়া যায়।

আফগানিস্থানের বীর সন্তান আলী আহ্‌মদ জানকে বন্দী করিয়া বাচ্চা তাঁহাকে যে ভাবে মৃত্যুদণ্ড দিয়াছে, তাহাতেই সে আপনার মৃত্যুদণ্ডের দুর্ভাগ্য অর্জ্জন করিয়াছে। তাহার বশ্যতা স্বীকার করিতে কিছুতেই সম্মত না হওয়ায় বাচ্চাই-সাক্কা তাঁহার নাসিকার মধ্য দিয়া দড়ি প্রবেশ করাইয়া দেয় এবং তাঁহার উভয় হস্ত পেরেক দ্বারা আবদ্ধ হয়। যখন ক্ষতস্থান হইতে প্রচুর পরিমাণে রক্তস্রাব হইতেছিল, সেই সময় কামানের মুখে তাঁহাকে উড়াইয়া দেওয়া হয়। আফগানি-স্থানের বীর-সন্তানের এমন শোচনীয় পরিণতি, বোধ হয়, আর কখনও হয় নাই!

আফগানিস্থানের উদ্ধারকর্ত্তা নাদের খান্

পাপ আপনার পরিণতি আপনি ডাকিয়া আনে। ক্রমশঃ যে সমস্ত উপজাতি তাহার পক্ষাবলম্বন করিয়াছিল, তাহারা তাহার আসল রূপ দেখিয়া ক্রমশঃ তাহার দল ত্যাগ করিতে লাগিল। বহু মোল্লা অবশেষে তাহার বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। শোরবাজারের পীর তাহাদের অন্যতম। বাচ্চা শোরবাজারের পীরসাহেবকে বন্দী করিয়া রাখিল। কিন্তু হত্যা আর বন্দী করিয়াই তো একটা জাতির সিংহাসনে বসিয়া থাকা যায় না।

বাচ্চা তখন হয়ত জানিত না যে, তাহার সমস্ত কর্ম্ম তাহারই ফাঁসীর রজ্জু তৈয়ারী করিতেছিল। কারাগারে নিহত আফগান যুবরাজের আত্মা, আলী আহ্‌মদ জানের অ-শরীরী মূর্ত্তি, প্রতিমুহূর্ত্তে এই ভয়াবহ পাপের শাস্তি প্রার্থনা করিতে-ছিল, এবং অচিরেই সে-শাস্তি আসিল!

প্যারির প্রবাস ত্যাগ করিয়া রোগ-রুগ্ন-দেহে জীবনের সায়াহ্ন-লগ্নে যোদ্ধা আবার তরবারি ধরিলেন। একদিন থলের সমর-প্রাঙ্গণে যে-বীর জাতির সম্মানকে প্রতিষ্ঠা করিয়া যান, পুনরায় জাতির নিমজ্জমান সম্মান ও গরিমাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য বার্দ্ধক্যে রণ-সজ্জা পরিলেন। সিংহাসনের জন্য নয়, জাতির

কল্যাণের জন্য নাদের খান্ প্যারি হইতে পুনরায় আফগানিস্থানের সমর-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলেন।

জীবন-মরণ-সঙ্গী মাত্র দুই ভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া নাদের খান্ ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯২৯ ভারতে পদার্পণ করেন। উপজাতিদের মধ্যে তাঁহার প্রভাবের অন্য যে কারণ ছিল, সে তাঁহার বীরত্ব। উপজাতিরা সাক্ষাৎভাবে সে বিষয় জানিত। তাই একান্ত সহায়-সম্বলহীন হইয়া এই বিপ্লব-দমনের দুঃসাহস লইয়া নাদের খান্ আফগানিস্থানে প্রবেশ করিতে সাহসী হইয়াছিলেন।

ওধারে বাচ্চার ব্যবহারে উপজাতিরাও ঘোরতর অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। শাহ্ওয়ালী খান্ ও হাশেম খান্ দুই দিক দিয়া কাবুল আক্রমণ করিলেন এবং তাঁহাদের পশ্চাতে সৈন্য লইয়া রহিলেন, নাদের খান্। বিনা বাধায় শাহ্ওয়ালী খান্ কাবুলের উপান্তে উপস্থিত হইলেন এবং বাচ্চার অবশিষ্ট সৈন্যদের পরাজিত করিয়া বিজয়ী রূপে কাবুলে প্রবেশ করিলেন। তাহার দুই-একদিনের মধ্যে নাদের খান্ সম্মিলিত উপজাতিদের জয়ধ্বনির মধ্যে কাবুলে ভ্রাতার সহিত মিলিত হইলেন।

বাচ্চাইসাক্কা বিপদ গণিয়া আর্গ দুর্গে আশ্রয় লইয়াছিল। নাদের খান্ কাবুলে প্রবেশ করিয়াছেন, সংবাদ পাইয়া সে আর্গ-দুর্গের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পলায়ন করে। কিন্তু অচিরেই দলবল-শুদ্ধ ধরা পড়ে এবং রাজ-বিচারে বাচ্চাইসাক্কা ও তাহার অনুচরগণের মৃত্যুদণ্ড হয়।

নাদের শাহ্ ১৯২৯ সালে কাবুলের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন এবং সেই দিন হইতেই আফগানিস্থানের আভ্যন্তরিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য সর্ব্বপ্রথম সকল শক্তি প্রয়োগ করিতে থাকেন। সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তিনি আফগানজাতির সংক্ষুব্ধ মনস্তত্ত্বকে শান্ত করিতে চতুর রাজনৈতিকের মত সর্ব্বপ্রথম চেষ্টা করেন।

অবশ্য নাদের শাহ্ সম্পূর্ণভাবে যে আপনাকে অজ্ঞ জনসাধারণের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, ইহাও ঠিক নয়। অশিক্ষিত এবং উগ্র-স্বভাব-সম্পন্ন জনসাধারণকে স্ব-মতে আনিবার কৌশলে নাদের শাহ্ সু-পণ্ডিত।

তাই তাঁহার প্রবর্ত্তিত নীতি বাহিরের দিকে একটা রক্ষণশীলতা যেমন পরিস্ফুট, সেইরূপ ভিতরের দিক দিয়া তিনি অতর্কিতে আফগান-জাতিকে আমানুল্লাহ্‌র নির্দ্দিষ্ট সংস্কারের পথেই লইয়া চলিয়াছেন। যে সংস্কারের কথায় একদিন তাহারা বিপ্লবী হইয়াছিল, ধীরে ধীরে আপনাদের অজ্ঞাতসারে আফগানজাতি সেই সংস্কারের দিকেই অগ্রসর হইতেছে !

তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র কাবুলের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং পিতার নীতি অনুসরণ করিয়াই তিনি আজ এই সামরিক জাতিকে ধীরে ধীরে বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও সমকক্ষতার দিকে আগাইয়া লইয়া চলিয়াছেন।

নবীন তুরস্ক

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এশিয়ার মধ্য অঞ্চলে একবার এক ভয়াবহ অনাবৃষ্টি হয়।

সেই অনাবৃষ্টির ফলে মাঠে মাঠে যাহা কিছু শস্য ছিল, সব ফল দিবার পূর্ব্বেই জ্বলিয়া পুড়িয়া গেল, মাটি ফাটিয়া চৌচির হইয়া গেল, জ্বলন্ত কড়া হইতে যেমন আগুনের বাষ্প উঠে, তেমনি পৃথিবী হইতে একটা উত্তাপ উপরের সূর্য্যের উত্তাপের সঙ্গে মিশিয়া সমস্ত মধ্য এশিয়াকে যেন পুড়াইয়া ফেলিবার মত করিয়া তুলিল। ঘরে ঘরে লোক অনাহারে মরিতে লাগিল। জলের অভাবে পশুপক্ষী লোকজন সব দলে দলে বেহুঁস হইয়া পড়িল।

সেই সময় কোন উপজাতি স্ত্রী-পুত্র-পরিবার এবং গৃহস্থালীর যাহা কিছু জিনিসপত্র সব লইয়া, মরুভূমির তৃষ্ণার্ত্ত উষ্ট্রের মত, জলের অন্বেষণে বেরিয়ে পড়ে···এই উপজাতিদের মধ্যে সেই

সময় ওসমান্‌লি তুর্কীরাও ছিল। তাহাদের দলপতি স্থলেমান শাহ্‌র নেতৃত্বে তাহারা জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া অধিকতর জলময় অঞ্চলের দিকে যাত্রা করিল।

ইহাদের দেশ ছিল গোবী মরুভূমির ধারে স্থঙ্গারিয়ার সমতলক্ষেত্রে। এই মরুভূমির চারিদিকে ক্ষুধিত মৃত্যুর মত ঘুরিয়া বেড়াইত, ধূম-মলিন সব নেকড়ের দল। রাত্রে তাহাদের চীৎকারে ওসমান্‌লি-তুর্কী-ছেলেরা ঘুমাইয়া পড়িত···গোবি মরু-ভূমির রুক্ষতার সঙ্গে, তাহার প্রান্তরচারী এই নেকড়ের ভয়ঙ্করতা, তাহাদের চরিত্রে মিশিয়া গিয়াছিল। তাই তাহারা সেই সময় ছিল, বন্য এবং ভয়ঙ্কর, কিন্তু তাহাদের একমাত্র গুণ ছিল, দলপতির আনুগত্য···যাহাকে দলপতি বলিয়া তাহারা মানিত, তাহার কথায় তাহারা উঠিত-বসিত।

সেই জলহীন নিষ্করুণ দিনের তীব্র জ্বালা সহ্য না করিতে পারিয়া স্থলেমান শাহ্‌ তাঁহার ওসমানলি তুর্কদের নিয়ে গোবি মরুভূমির ধার হইতে প্রথমে চলিলেন পশ্চিম দিকে। কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হইয়া তিনি জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার পিছনে দুর্দ্ধর্ষ তাঁতাররা আসিতেছে। তিনি কিছুদূর পশ্চিমে অগ্রসর হইয়া আবার দক্ষিণ দিকে ফিরিলেন···আর্ম্মেনিয়ার ভিতর দিয়া···এশিয়া মাইনরের ভিতর দিয়া···সোজা চলিয়া আসিলেন, বর্ত্তমান ইতিহাসের আলোক-উজ্জ্বল প্রান্তরে···

স্থলেমান, তারপর তাঁহার পুত্র এর্‌তোস্‌বল, তারপর আমীর ওস্‌মান, তারপর স্থলতান ওর্‌শান···এই ভাবে পিতা

হইতে পুত্র, দশ বংশ ধরিয়া ক্রমান্বয় চলিয়া আসিল ··একজন সুলতানের পর আর একজন সুলতান···গোবির মরু-বাতাস হইতে তাঁহারা যে ভয়ঙ্করতা লইয়া আসিয়াছিলেন, এশিয়া মাইনরের জলীয় মাটীতে ক্রমশঃ ক্রমশঃ তাহা একটু একটু করিয়া বদলাইতে লাগিল······

এই নূতন জাতি তাহাদের সম্মুখে এশিয়া মাইনরের চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, একটীর পর একটী বলিষ্ঠ জাতির কবর একে একে খোঁড়া হইতেছে···সেলসুকরা নিস্তেজ হইয়া ঘুমাইয়া পড়িতেছে···বোগদাদ জরাজীর্ণ···বৈজান্‌টাইন অসহায় পঙ্গু··· একে একে ওসমানলি তুর্কীরা তাহাদের পরাজিত করিয়া সেইখানে তাহাদের নূতন দেশ ও সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিল।

সুলেমান শাহের দশ বংশ পরে, যখন সুলতান সুলেমান সেই তুর্কী-সিংহাসনে বসিলেন, তখন এই সাম্রাজ্য য়ুরোপের আড্রিয়াটিক উপসাগরের তীর হইতে পারস্যের সীমান্ত পর্য্যন্ত, মিশর হইতে ককেসাস পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। য়ুরোপের মধ্যে তখন তাহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ, হাঙ্গেরী তাহার প্রভাবে, ক্রিমিয়া তাহার অধীনে···য়ুরোপের বড় বড় রাজাদের যখন নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বাঁধিত, তাহারা আসিত, তুরস্কের কাছে সাহায্যের জন্যে, রীতিমত উপঢৌকন লইয়া।

পূর্ব্বজগতে আসিবার স্থলপথে তুরস্কের সেনানী অলঙ্ঘ্য প্রাচীরের মত দণ্ডায়মান···ভূমধ্যসাগরে তাহার রণতরীকে বাধা দিবার জন্য আর কোন শক্তি নাই···য়ুরোপ ও এশিয়া ছাড়াইয়া

উত্তর আফ্রিকা পর্য্যন্ত তাহার সাম্রাজ্য বিস্তৃত···১৫৮০ সালে সে ভিয়েনার দ্বারে গিয়া হানা দেয়···এবং সেদিন গোবি মরুচারী ধূম-মলিন এই নেকড়ের আক্রমণে মধ্য যুগের য়ুরোপ ঘুমের ঘোরে ভয়ে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিত······

কিন্তু এই শক্তি আপনার ভার বহিতে আর বেশীদিন পারিল না···সব সাম্রাজ্য আবার যেমন ভিতর হইতে টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া পড়ে, তেমনি এই বিরাট তুরস্ক সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল···তখন তাহার বিশালতা হইল তাহার বাঁচিয়া থাকিবার সব চেয়ে বড় অন্তরায়···

সুলতান সুলেমানের আমলেই তুরস্ক সাম্রাজ্য তাহার সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ মহিমা অর্জ্জন করে, কিন্তু তাঁহার পর সুলতান হইলেন, সেলিম। কথিত আছে যে, সেলিমের মধ্যে রাজ-বংশের ধারা ক্ষুণ্ণ হয় এবং সেলিম হইতে ক্রমান্বয় বংশ-পরম্পরায় সাতাশ জন সুলতান তুরস্কের সিংহাসনে বসেন। কিন্তু এই সাতাশ জনের রাজত্বকালে ধীরে ধীরে একটু একটু করিয়া যে অপচয় ও অনাচার সুরু হয়, তাহার ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীতে যখন তাহারা আসিয়া পৌঁছিল, তখন তাহাদের দেহ, মন ও আত্মার চতুঃসীমা হইতে সেই আদিম শক্তি ও তেজ সম্পূর্ণভাবে কর্পূরায়মান হইয়া গিয়াছে···এক অলস, বিলাসী এবং সুখ-সর্ব্বস্ব স্বেচ্ছাতন্ত্র কোন রকমে নিজের রাজ-দরবারের আড়ম্বর-টুকু বজায় রাখিয়া জাতির অস্তিত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিয়াছিল···নেকড়ে বাঘ হইয়া গিয়াছিল শৃগাল!

সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ মূল দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবার জন্য বিপ্লব ঘোষণা করিল···গ্রীস্, সার্বিয়া, বুলগেরিয়া এইভাবে নিজেদের স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়া তুরস্ক সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। তখন য়ুরোপের আদিম জাতিরা নূতন রাজনৈতিক দৃষ্টিতে য়ুরোপের সীমা ছাড়িয়া বৃহত্তর জগতের দিকে ফিরিয়া যাইতেছে···প্রথম দৃষ্টি তাহাদের পড়িল, য়ুরোপে তুরস্কের উপর···পঙ্গু, জীর্ণ ও তন্দ্রাচ্ছন্ন···

রাশিয়া আবার ক্রিমিয়া এবং ককেশাস অঞ্চল কাড়িয়া লইল এবং দার্দ্দেনালিসের ভিতর দিয়া ভূমধ্যসাগরে যাতায়াত-পথের উপর দাবী বসাইল···ফ্রান্স, সিরিয়া এবং টিউনিস কাড়িয়া লইল···ইংলণ্ড, মিশর এবং ক্রিট দখল করিল···বৃহৎ তুরস্ক সাম্রাজ্যের এক এক অঙ্গ এইভাবে তাহার দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল···

একমাত্র জার্ম্মানী শুধু অসহায় তুরস্ককে বলিল, আমি তোমার বন্ধু···ইহারা তোমাকে এমনি দুর্ব্বল পাইয়া একে একে একটীর পর একটী তোমার সাম্রাজ্য কাড়িয়া লইয়াছে, আমি তোমাকে সাহায্য করিব, যাহাতে তাহা বন্ধ হয়, তাহার বদলে, তোমার দেশে আমাকে দিতে হইবে, অবাধ বাণিজ্যের অধিকার ···তোমার সৈন্যদের গড়িয়া তুলিবে, আমার সেনাপতি··· তোমার কুলিরা কাজ করিবে, আমার বিশেষজ্ঞদের অধীনে···

দ্বিতীয় আবদুল হামিদ সেই শর্ত্তে রাজী হইয়া জার্ম্মানীর বন্ধুত্ব কিনিলেন এবং যখন গত য়ুরোপীয় মহাসমর লেলিহান

শিখায় জ্বলিয়া উঠিল, তখন তুরস্ক বাধ্য হইয়াই জার্ম্মানীর পাশে দাঁড়াইয়া সেই যুদ্ধে নামিয়া পড়িল।

নব জাগরণ

গত মহাযুদ্ধে বহু মানুষের জীবন-নাশ হইয়াছে, য়ুরোপের মাটী মানুষের রক্তে সরস হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সেই ভয়াবহ ক্ষতির মধ্য হইতে, এক নূতন জীবনের স্পন্দন দেখা দেয়, যাহার প্রেরণায় জগতের এক নূতন ধরণের মানুষ জাগিয়া উঠিল, যাহারা আবার নূতন করিয়া তাহাদের দেশকে গড়িয়া তুলিল।

গত মহাযুদ্ধের সমাধিস্থল হইতে যাহারা নব-জীবন লইয়া জাগিয়া উঠিয়াছে, তুরস্ক তাহাদেরই একজন। কামাল আতাতুর্ক তুরস্কের সেই নতুন লোক···যিনি নতুন করিয়া সুলেমান শাহ্‌র রাজত্বকে আবার এই বিংশ শতাব্দীর জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়া গিয়াছেন। এবং আজকাল তুরস্কদের কাহিনী সেইজন্য সর্ব্ব অংশে সেই একটি অদ্ভুত ব্যক্তিত্বের আত্ম-প্রকাশের সঙ্গে জড়িয়া গিয়াছে।

আজ এই যুদ্ধ-গ্রস্ত পৃথিবীতে য়ুরোপের প্রায় প্রত্যেক দেশ ও জাতি সাক্ষাৎভাবে এই বিশ্বব্যাপী অনল-দাহের মধ্যে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছে···য়ুরোপের এক প্রান্তে তুরস্ক সেই দাহ হইতে আত্মরক্ষা করিবার চেষ্টা এখনও করিতেছে···তাহার

এই নির্লিপ্ততা আর কত দিন থাকা সম্ভব, তাহা রাজনৈতিকদের একটা প্রধান চিন্তার বিষয় হইয়াছে।

য়ুরোপের মধ্যে তুরস্ক একটী বিচিত্র স্থান অধিকার করিয়া আছে। মনোচিত্রের দিক হইতে তাহার দেহ য়ুরোপের অন্তর্ভুক্ত, মানচিত্রের দিক হইতে তুরস্কের আত্মা এশিয়ার দেহভুক্ত। এইভাবে এই দুই মহাদেশ এবং দুই বিভিন্ন মহাসভ্যতার সংযোগ-স্থলে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, তুরস্ক বহুদিন যাবৎ আপনার এক বর্ণহীন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া আসিয়াছিল।

অবশেষে এই বিংশ শতাব্দীতে তুরস্কে এমন একজন মানবনেতা জন্মগ্রহণ করিলেন, যিনি তুরস্কের দেহ ও আত্মার ভৌগোলিক অবস্থানের এই অসামঞ্জস্য দূর করিয়া, তুরস্ককে একটী বিশেষ সীমা-রেখার মধ্যে ফ্রেমে-আঁটিয়া রাখিয়া দিয়া গেলেন। সেই মানবনেতা হইলেন, কামাল আতাতুর্ক।

কামাল আতাতুর্ক আসিয়া দেখিলেন, তুরস্কের দেহ পড়িয়া রহিয়াছে, য়ুরোপে, তাহার মন পড়িয়া রহিয়াছে, এশিয়ায়। তাই মন পারে নাই, দেহকে সবল ও সুস্থ করিয়া রাখিতে। তাহার আর এক সব চেয়ে বড় অন্তরায় ছিল, কামাল আতাতুর্ক দেখিলেন, তুরস্কের দেহ পড়িয়া রহিয়াছে, বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক য়ুরোপে, কিন্তু সেই দেহের ভিতর ধমনীতে বহিতেছে, বিলুপ্তস্মৃতি মধ্য যুগের প্রাণ-হীন জলীভূত সব রক্ত-কণিকা···সে রক্ত-কণিকা দেহকে পারে নাই সোজা দাঁড় করাইয়া রাখিতে!

তাই তাহার দেহ রুগ্ন হইয়া সবল প্রতিবেশীর অনুকম্পার উপর এপাশ-ওপাশ করিয়াছিল মাত্র। য়ুরোপের অন্য সব দেশ তাই তাহার নাম দিয়াছিল—"The Sickman of Europe অর্থাৎ য়ুরোপের রুগ্ন জাতি।"

তুরস্কের দেহ যেমন পড়িয়াছিল, য়ুরোপে, তেমনি তাহার মন ও আত্মা ছিল, এশিয়ায়। য়ুরোপ হইতে এশিয়ায় বা এশিয়া হইতে য়ুরোপে মন দেওয়া-নেওয়ার পথ এক সময় এক রকম বন্ধ ছিল, তখন এই দুই মহাদেশের মন দুই স্বতন্ত্র ধারায় নিজের বৈশিষ্ট্যে জাগিয়া উঠিয়াছিল।

তারপর নানাভাবে নানাদিক হইতে তৈয়ারী হইল, নানা পথ···যে সব পথ দিয়া এই দুই মহাদেশের মনের সওদার দেওয়া-নেওয়ার ব্যবসা চলিতে লাগিল···পরস্পর পরস্পরের মনের দেখাশুনার ফলে একের প্রভাব আর একজনের উপর আসিয়া পড়িল···দু'দিকে যেখানে যেখানে ছিল খালি শূন্য জায়গা, তাহা হইয়া গেল ভরাট !

তারপর আসিল, পৃথিবীতে লোভ আর লাভের দিন, এই দুই মহাদেশের মনের বেসাতীর জন্য যে সব পথ, সব বন্ধ হইয়া গেল, খোলা রহিল, শুধু একটা পথ, যে-পথ দিয়া অবাধে চলিল, শুধু লাভের ব্যবসা।

এই সময় এশিয়ার মন পড়িয়া রহিল, ভাঙ্গা রথের মত পথের এক ধারে··তাহার উপর দিনের পর দিন, পড়িতে লাগিল ধূলা, জমিতে লাগিল শেওলা, গজাইয়া উঠিল হাজার

রকমের আগাছা···আতাতুর্ক দেখিলেন, রুগ্ন-দেহ তুরস্কের আত্মা তেমনি য়ুরোপ-এশিয়ার রাজ-পথের বহু ভগ্ন-চক্ররথের মত ধূলা আর শেওলায় আর আগাছায় ভর্ত্তি হইয়া আড় অবস্থায় পড়িয়া আছে···তাহাকে দেখিয়া বুঝিবার আর উপায় ছিল না যে, সে রথ একদিন নড়িয়াছিল···চলিয়াছিল !

কামাল আতাতুর্ক তাই এশিয়ার বহু দেশের লোকের কাছে, তাঁহার জীবন ও সাধনা দিয়া এক নূতন আশার কথা জাগাইয়া দিয়া গিয়াছেন···তাই নূতন তুরস্ক সমগ্র এশিয়ার নিকট এক নূতন সার্থকতার মূর্ত্তি লইয়া দেখা দিয়াছে···মুমূর্ষু এশিয়ার কাণে নবীন তুরস্ক নব জীবনের স্বপ্নকে আশার জীবন্ত মন্ত্রে অনুপ্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছে।

কামাল আতাতুর্ক তাঁহার অল্পপরিসর জীবনে তুরস্কের জীবনের এই ভিতর-বাহিরের গোলমাল এবং গোঁজামিলকে ভাঙ্গিয়া গুঁড়াইয়া দিয়া গেলেন !

তিনি বলিলেন, তুরস্কের দেহ যখন য়ুরোপে, তখন সেখানকার আলো-বাতাসে যে প্রাণ আছে, তাহাকে সমগ্রভাবে তাহা লইতে হইবে···তাহার দেহ যদি আসিয়া পড়িতেছে, বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক জগতে, তাহার মনকেও গড়িয়া তুলিতে হইবে, সেই বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক মাল-মশলায় ···তাহার মনের উপর জমা হইয়াছে, যুগ-যুগান্তের যে ধূলা, তাহাকে করিতে হইবে ধূলিহীন নির্ম্মল, সেখানে গজাইয়াছে যে সব আগাছা, নির্ম্মম হাতে টানিয়া ছিড়িয়া উপড়াইয়া

পুড়াইয়া ফেলিতে হইবে তাহাকে, যাহাতে অন্য জায়গায় পড়িয়া সে আবার শিকড় না লইতে পারে মাটীতে।

কামাল তুরস্কের উপর এই পরীক্ষা করিয়া গিয়াছেন… এবং তাঁহার সৌভাগ্য যে, তিনি তাঁহার জীবদ্দশায় তাঁহার পরীক্ষার ফল কিছু দেখাইতে পাইয়াছিলেন। তাই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তুরস্কের প্রভাব-কেন্দ্র য়ুরোপে থাকিলেও, আজ এশিয়ার লোক তাহাকে আপনার বলিয়া সম্বন্ধ স্থাপন করিতে চাহিয়াছে।

কামালের পূর্ব্বজীবন

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ জগতের ইতিহাসে একটা বিস্ময়কর যুগ। এই সময় সমুদ্র পর্ব্বতের বাধা উল্লঙ্ঘন করিয়া সমগ্র পৃথিবী একটা বিরাট বাণিজ্যক্ষেত্রে পরিণত হয়…মানুষ একটা নূতন শক্তি তাহার হাতে পায় · বিজ্ঞান…যাহার ফলে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং সেই সঙ্গে তাহার পৃথিবী একটা সম্পূর্ণ নূতন রূপ লইতে থাকে…এবং সেই সময় পৃথিবীর দেশ-দেশান্তরে জীবনের অতি নিম্নস্তরে, অতি সাধারণ সব মানুষের ঘরে, অতি অসাধারণ একদল লোক জন্মগ্রহণ করেন, রাশিয়া হইতে ভারত পর্য্যন্ত…যাদের প্রভাবে এই অঞ্চলের পৃথিবীর চেহারা সম্পূর্ণ বদলাইয়া যায়।

তুরস্ক সাম্রাজ্য যখন ভাঙ্গিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া পড়িয়াছিল, সেই সময় সালোনিকার এক দরিদ্র কেরাণীর ঘরে কামাল জন্মগ্রহণ করেন। কোন অজ্ঞাত রহস্যময় সৃজন-তত্ত্বের ইঙ্গিতে কামাল তাঁহার রক্তে সেই আদিম ওসমান্‌লি তুর্কীর রণ-পিপাসা, তাহার শক্তি, তাহার কঠোরতাকে বহন করিয়া লইয়া আসেন। • সেই সব প্রবৃত্তি তাঁহার মধ্যে এত বেশী মাত্রায় ছিল যে, ছেলেবেলা হইতেই কাহারও শাসন তিনি মানিতে পারিতেন না। স্কুলের চেয়ে তাই তাঁহাকে বেশী করিয়া টানে, যোদ্ধার তরবারি। তাই স্কুল পলাইয়া তিনি ছেলেবয়সেই ঢুকিলেন, সৈন্য-গড়ার কারখানায়। সেখানে যৌবনের আরম্ভেই তিনি পুরামাত্রায় শিক্ষিত সৈনিক হইয়া উঠিলেন।

এই সামরিক কলেজে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করার সঙ্গে সঙ্গে কামালের দৃষ্টি পড়িল, দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপর। রাত্রিবেলায় হঠাৎ ঘুম হইতে জাগিয়া উঠে, তরুণ সৈনিক সেই ঘরে বসিয়া জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিতেন···

বক্তৃতা দিতে দিতে দাঁড়াইয়া উঠিতেন, যেন তাঁহার সামনে অগণিত লোক দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তিনি তাঁহাদের যুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াছেন···সেই সুযোগ আনিয়া দিল গত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধ···কিন্তু বহুদিন লাগিয়াছিল, তাঁহার অন্তরের রণ-পিপাসাকে নিজের মতন করিয়া চরিতার্থ করিতে···বাধার পর বাধা তাঁহাকে সেনাবাহিনীর একপাশে বহুদিন ধরিয়া সেনাপতি সাজাইয়া বসাইয়া রাখিয়াছিল !

তখন রাজনীতিকদের রাজত্ব···সৈনিক শুধু রাজনীতিকের আজ্ঞাবহ···নিজের নিজের স্বার্থ ও শক্তিকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য পুরাতন-পন্থী সব রাজনৈতিক নেতারা দুর্ব্বল সুলতানকে কেন্দ্র করিয়া শুধু কথার জালই বুনিয়া চলিয়াছিল···সহসা আসিল সৈনিকের সুযোগ···

রাজনৈতিকদের রাজনীতির ফলে যখন গ্রীক সৈন্যরা তুরস্ক ছাড়িয়া চলিয়া গেল না···বরঞ্চ দেখা গেল যে, এক দিনের পরাজয়ের প্রতিশোধ লইবার জন্য অন্য শক্তির সাহায্যে গ্রীস তুরস্কের ভিতরে বসিয়া তুরস্কের হৃৎপিণ্ডে আঘাত করিতেছে··· তখন আসিল কামালের সুযোগ···রণ-ক্ষেত্রে সৈনিকের সুযোগ···

স্মার্ণার রণক্ষেত্রে গ্রীকদের বিতাড়ন আজিকার যুগের যুদ্ধের একটা মস্ত বড় বিজয়নিদর্শন এবং সেদিন সৈন্যদের নেতা-রূপে কামাল স্মার্ণার রণক্ষেত্র হইতে যে বিজয়-শক্তি পাইলেন, তাহাই লইয়া তিনি কথা-সর্ব্বস্ব রাজনৈতিক নেতাদের ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া তুরস্কের সিংহাসনের দিকে আগাইয়া চলিলেন···

সোনার সিংহাসনের সব কয়টা পায়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, শুধু একটা ধাক্কা দিলেই তাহা পড়িয়া যাইবার মতন হইয়াছিল···কামাল সেই ধাক্কা দিতেই তাহা পড়িয়া গেল··· তুরস্কের শেষ সুলতান তুরস্ক ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন··· কামাল সে-সিংহাসন মাটী হইতে উপড়াইয়া ফেলিয়া সে

যায়গায় এক নূতন আসন করিলেন, যে-আসন হইতে সব মানুষের সঙ্গে সমান স্তরে দাঁড়াইয়া কথা বলা যায়।

এতদিনের রাজতন্ত্রের বদলে তুরস্কে গণ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল, কিন্তু গণ-তন্ত্রকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে, চাই মানুষ ·· গণ-তন্ত্রের মহিমা বোঝে যে মানুষ···এবং সজ্ঞানে গণ-তন্ত্রের শাসন মানিবে যে-মানুষ···সেই ধরণের মানুষের কাঁধে যদি না বসে গণ-তন্ত্রের আসন, তবে তাহাকে রক্ষা করা বড় কঠিন।

তাই কামাল, আদিম ওসমান্‌লি তুর্কীর রূঢ়-কঠোরতা লইয়া, যাহা কিছু সেই নূতন-মানুষ গড়িয়া তুলিবার বাধা, তাহাকে উচ্ছেদ করিলেন···যাহা কিছু সেই নূতন মানুষকে গড়িয়া তুলিবার সহায়ক তাহাকে বরণ করিয়া লইলেন··· ওসমান্‌লি তুরস্ক সাম্রাজ্যের কবরস্থান হইতে এক নূতন সজীব তুরস্ক জাগিয়া উঠিল।

পুরানো রাজধানী ত্যাগ করিয়া এঙ্গোরায় নূতন রাজধানী হইল, নূতন শাসনপরিষদের নাম হইল, দি গ্রাণ্ড ন্যাশানাল এসেম্‌ব্লী···কামাল হইলেন, তাহার প্রথম সভাপতি।

সভাপতি হইয়া কামাল প্রথম য়ুরোপের অন্য সব রাষ্ট্রকে জানাইয়া দিলেন, তুরস্কের পিঠ চাপড়াইয়া মুরুব্বিয়ানা করা কোন আর জাতির চলিবে না···তাহার দুর্ব্বলতার সুবিধা লইয়া অন্য সব রাষ্ট্র তাহার ঘাড়ে যে সব সন্ধির শর্ত্ত চাপাইয়াছে, নূতন তুরস্ক তাহা মানিবে না···তাহার সঙ্গে নূতন করিয়া মৈত্রীর

বন্ধন করিতে হইবে···এবং তাহার শর্ত্তের পিছনে কোন গোঁজামিল তুরস্ক সহিবে না।

নবীন তুরস্কের এই উদ্ধত বাণীতে য়ুরোপের অন্য সব রাষ্ট্র প্রথম প্রথম কৌতুকের আভাসই পাইয়াছিলেন। কিন্তু কামাল অতি অল্পদিনের মধ্যে বুঝাইয়া দিলেন যে, তিনি যে ঘোষণা করিয়াছেন, তাহা অক্ষরে অক্ষরে য়ুরোপ গ্রহণ করিতে বাধ্য। এবং কামাল য়ুরোপকে তাই গ্রহণ করিতে বাধ্য করিলেন।

সেদিন পর্য্যন্ত যে ছিল, য়ুরোপের রুগ্ন ব্যক্তি, সে আজ হইয়া উঠিল, য়ুরোপের বিজয়ী জাতি-সঙ্ঘের একজন বিশিষ্ট সভ্য। প্যারিসের বিখ্যাত অধিবেশনে বসিয়া প্রেসিডেণ্ট উইলসন, লয়েড জর্জ্জ এবং ক্লেমেঁসু যখন শুনিলেন যে, কামাল পাশা শেষ ইংরেজটীকে পর্য্যন্ত তুরস্ক হইতে বিতাড়িত করিয়া দিয়াছেন, তখন প্যারিস অধিবেশনের কার্য্যসূচীর কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিতে তাঁহারা বাধ্য হন।

যেদিন কামাল এই ভাবে বিজয়ী হইয়া নিজের মহিমার সঙ্গে তুরস্কের মহিমার আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিলেন, সেদিন প্রকৃতপক্ষে আসিল, তাঁহার আত্মিক পরীক্ষা। সেদিন ইচ্ছা করিলে, তিনি অনায়াসে তুরস্কের সুলতান হইয়া বসিতে পারিতেন এবং হয়ত তুরস্কের বাহিরে অন্য ইসলাম-ধর্ম্মী রাষ্ট্রে তুরস্কের প্রভাব বিস্তার করিতে পারিতেন, কিন্তু সেই বিরাট জয়-কীর্ত্তি তাঁহার মস্তিষ্ককে ফাঁপাইয়া তুলে নাই। তিনি বুঝিয়াছিলেন, সাম্রাজ্যগঠনের দিন চলিয়া গিয়াছে এবং যাহাদের লইয়া সেই সাম্রাজ্য

গড়িয়া তুলিতে হইবে, তাহাদের মধ্যে এতখানি সংস্কারের প্রয়োজন যে, সকল শক্তি এখন সেই দিকেই প্রয়োগ করিতে হইবে।

ইহা ছাড়া সেই সময় জগতের ইসলাম-ধর্ম্মী অন্য সব রাষ্ট্র হইতে তিনি যে অভিনন্দন পান এবং ইসলাম-ধর্ম্মী বিভিন্ন রাষ্ট্রের সমবায়ে এক বিরাট সাম্রাজ্য গঠনের আশা সেই সময় যেমন অনেক লোককে উত্তেজিত করিয়া তোলে, কামালকে বিচলিত করিতে পারে নাই।

সেই বিরাট কল্পনার অসারতা এবং অসাময়িকতা তিনি সেই জয়-গর্ব্বের মধ্যে অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করিয়াছিলেন; এবং সেইজন্যই বাস্তবজ্ঞানসম্পন্ন বিশেষজ্ঞের মত তিনি ঘোষণা করেন, আমি ইসলাম-ধর্ম্মাবলম্বী বিভিন্ন রাষ্ট্রের সমবায়ে গঠিত লীগ অফ নেশন্‌স-এ বিশ্বাস করি না কিংবা তুর্কী জাতির লীগ অফ নেশন্‌স-এ বিশ্বাস করি না। প্রত্যেক জাতি তাহার স্বাভাবিক ভৌগোলিক সীমা-বন্ধনের মধ্যে, সেই জাতির স্বাধীনতা ও মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য একটা স্থায়ী, প্রাণবন্ত এবং শক্তিশালী শাসন-তন্ত্র গড়িয়া তুলুক··· এই হইল একমাত্র রাজনীতির আদর্শ···এখানে কোন কল্পনা বা ভাব-প্রবণতার কোন স্থান নাই···দূর হইয়া যাউক্ অলীক ছায়া আর স্বপ্ন···অতীতে বহুবার এই অলীক ছায়া আমাদের মোহমুগ্ধ করিয়া আমাদের নিকট হইতে অপরিশোধ্য কর আদায় করিয়া লইয়াছে···

এই সম্পর্ককে তিনি বলিলেন, জগতে অত্যাচারী বলিয়া কেহ নাই, অত্যাচারিত বলিয়াও কেহ নাই · আছে শুধু তাহারা, যাহারা নিজেদের অত্যাচারিত হইতে দেয়···তুরস্ক এই-টুকু জানে যে, সে সেই দলে আর নাই···তুরস্ক তাহার নিজের ভাবনা নিজে ভাবিতে পারে···অপরের ভাবনা অপরে ভাবুক···

বিপ্লবী কামাল

বিপ্লবের পর কামালের শাসনে প্রথমে দুইটী প্রধান সমস্যা ছিল—

প্রথম, য়ুরোপের রাষ্ট্র-সভায় নবীন তুরস্কের ন্যায্য স্থান করিয়া নেওয়া।

দ্বিতীয় হইল, তুরস্কের ভিতরে এই নূতন শাসন-ব্যবস্থাকে প্রতিদ্বন্দ্বিহীন দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা।

বাস্তবক্ষেত্রে অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞের মত কামাল প্রথমে এই দুইটী সমস্যার সমাধান করিয়া, তারপর তৃতীয় সমস্যার সম্মুখীন হইলেন, যে-সব কারণে তুরস্ক বৃদ্ধ, স্থবির ও জড় হইয়া পড়িয়াছে, সেই সব কারণ অথবা সেই সব কারণের মূলকে কঠোরভাবে উপড়াইয়া ফেলিয়া দিতে হইবে।

বিশ্লেষণ করিয়া তিনি দেখিলেন যে, রাজতন্ত্রের সঙ্গে ধর্ম্মের অবৈধ মেলামেশার ফলে রাষ্ট্র দুর্ব্বল হইতে দুর্ব্বলতর

হইয়া পড়িয়াছে। তাই তিনি আইন করিয়া এই সম্পর্কের উচ্ছেদ সাধন করিলেন। রাজতন্ত্রের সঙ্গে ধর্ম্মের কোন আনুষ্ঠানিক যোগ নাই। রাজনীতির ভার যাঁহাদের উপর থাকিবে, তাঁহাদের রাজনীতির স্কুলেই শিক্ষালাভ করিতে হইবে···ধর্ম্মের পাঠশালার পড়ুয়ার সঙ্গে রাজনীতির কোন যোগ নাই।

কামাল ছিলেন অন্তরে-বাহিরে বিপ্লবধর্ম্মী। যে-অতীতের সংস্পর্শে তুরস্ক পচিতে আরম্ভ করে, সেই অতীতকে কামাল একধারে ধুইয়া মুছিয়া ফেলিয়া দিতে চাহিলেন। ওসমানলি তুর্কের নির্ম্মমতায় তিনি নবীন তুরস্কের আশ-পাশ হইতে অতীত বা অতীতের স্মারক যাহা কিছু ছিল, তাহাকে ধ্বংস করিলেন।

তিনি চাহিয়াছিলেন, তুর্কীকে ভিতর এবং বাহির হইতে সম্পূর্ণ নূতন ভাবে গড়িয়া তুলিতে। তাহার পোষাক, তাহার খাওয়া-দাওয়া, তাহার আহার-অনুষ্ঠান, তাহার ভাষা, তাহার প্রতিদিনের জীবনের নানা ছোটখাটো সব জিনিস, যাহার সঙ্গে অতীতের কোন না কোন সম্পর্ক বা সম্বন্ধ ছিল, কামাল ক্ষিপ্তের মত তাহাদের উচ্ছেদ করিয়া, নূতন পোষাক, নূতন জীবন-যাত্রা-প্রণালী, নূতন আচার-অনুষ্ঠান, নূতন ভাষা, নূতন অক্ষর-প্রণালী, সমস্ত এই কাল ও দেশের সমধর্ম্মী করিয়া ভাঙ্গিয়া গড়িলেন।

পুরাতন সাম্রাজ্যের চিহ্ন ছিল, তুর্কীর মাথায় ফেজ। কামাল সেই ফেজ পরা বন্ধ করিলেন। কিন্তু এই সব সংস্কার

প্রবর্ত্তন করিতে, তিনি বুদ্ধিমানের মত বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতেন, কারণ, তিনি জানিতেন যে, জাতির মন না বুঝিয়া তাহার মাথা হইতে টুপি কাড়িয়া নেওয়া বা নূতন টুপি বসান খুব বিপদের কাজ।

যাহা করিয়া তিনি ফেজের প্রচলন বন্ধ করলেন, তাহা হইতে তাঁহার জনতার মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান বিশেষ ভাবে বোঝা যায়। এইখানেই সংস্কারকামী আমানুল্লাহ্‌-র সঙ্গে তাঁহার প্রভেদ।

যখন তিনি মনস্থ করিলেন যে ফেজ তুলিয়া দিতে হইবে, তখন প্রথমে তিনি তাঁহার নিজের শরীর-রক্ষী সৈন্যদের মাথা হইতে ফেজ তুলিয়া নূতন ধরণের টুপি দিলেন। দেখিলেন, তাহারা কোন প্রতিবাদ করিলেন না। তারপর সমস্ত সৈন্য-বিভাগে তিনি ফেজের পরিবর্ত্তে নূতন টুপির ব্যবস্থা করিলেন। সৈন্যেরাও বিনা প্রতিবাদে তাহা গ্রহণ করিল। তখন কামাল আশ্বস্ত হইল।

এইবার জনসাধারণের মাথায় হাত দিলেন। কৃষ্ণসাগরের তীর ধরিয়া তিনি ভ্রমণে বাহির হইলেন, মাথায় ফেজ নাই, তাহার বদলে নূতন টুপি। তুর্কীরা টুপিকে মনে-প্রাণে ঘৃণা করিত, যদি কোন তুর্কী মাথায় টুপি পরিত, তাহা হইলে তাহার পিছনে তাহারা হাততালি দিত···কামাল জন-সাধারণের সে মনোভাবের কথা বিশেষ করিয়াই জানিতেন, কিন্তু জনমতের সামনে দাঁড়াইবার তাঁহার ছিল দুর্জ্জয় শক্তি ··

য়ুরোপীয়দের মত টুপি পরিয়া তিনি প্রকাশ্য সভায় যোগদান করিতে লাগিলেন…

তাঁহার দেখাদেখি দু'একজন মাঝে মাঝে ফেজের বদলে টুপি ব্যবহার করিতে লাগিল, কিন্তু আসলে কামাল দেখিলেন যে, জনসাধারণ ব্যাপারটাকে গ্রহণ করিতে চাহিল না। যখন অনুরোধে হইল না, তখন কামাল শক্তি-প্রয়োগের ব্যবস্থা করিলেন।

তিনি জানিতেন যে, সৈন্য-বিভাগ তাঁহার মতের বিরুদ্ধে যাইবে না, সেটা তিনি পূর্ব্বে পরীক্ষা করিয়া লইয়াছিলেন, তাই তিনি আইন করিলেন যে, নবীন তুরস্কে ফেজ মাথায় দেওয়া বে-আইনী কাজ এবং পরের দিন পুলিশ রাস্তায় যাহার মাথায় ফেজ দেখিল, তাহা কাড়িয়া লইল।

এই ভাবে পুরানো যাহা কিছু, তাহা ভাঙ্গিয়া দিয়া কামাল সেই জায়গায় নূতন গড়িয়া তুলিতে লাগিলেন। অর্দ্ধেক ধর্ম্ম, অর্দ্ধেক আনুষ্ঠানিক নীতি আর অর্দ্ধেক আইনে মিশাইয়া যে বিচার-তন্ত্র ছিল, কামাল তাহা ফেলিয়া দিলেন। তাহার বদলে নূতন আইন গড়িয়া তুলিলেন।

বিশেষজ্ঞদের আনাইয়া য়ুরোপের অন্য সব জাতির আইন তন্ত্র ঘাঁটিয়া তিনি তুরস্কের নূতন আইনের ভিত্তি স্বরূপ তিনটী পদ্ধতি নিলেন, জার্ম্মানদের নিকট হইতে ব্যবসায়-সংক্রান্ত আইন, ইতালীয়দের নিকট অপরাধ-সংক্রান্ত আইন এবং সুইসদের নিকট হইতে নাগরিক জীবন সম্বন্ধে আইন।

জাতীয়তাবাদী কামাল

তারপরে তিনি অগ্রসর হইলেন, তুরস্ককে ষোল-আনা তুর্কী করিয়া তুলিবার জন্য।

প্রচলিত ভাষায় নানা আরবী এবং ফারসী শব্দ আসিয়া গিয়াছিল। বিশেষজ্ঞ বসাইয়া সেই সব ভিন্ দেশের শব্দকে নির্ব্বাসিত করিয়া দেওয়া হইল···

পুরানো পুঁথি, কাগজ, বই এবং দলিল হইতে অনুসন্ধান চলিতে লাগিল···সেই সব ভিন দেশের ভাষার পরিবর্ত্তে কি তাতার জাতীয় ভাষা আছে ··· কোরাণ এবং বাইবেল এই নূতন তুর্কী ভাষায় অনূদিত হইল ··· মসজিদে মসজিদে প্রার্থনা তুর্কী ভাষায় হইতে লাগিল ··· তুরস্কের ডাক-টিকিটের উপর সেই সুলেমান শাহ্‌র পতাকার চিহ্ন, ধূম-মলিন-নেকড়ে আবার দেখা দিল···

একদা নিজের সম্বন্ধে কামাল নিজে এই প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছিলেন, আমি শত্রুকে জয় করিয়াছি, নিজের দেশকে জয় করিয়াছি···কিন্তু জনসাধারণকে কি জয় করিতে পারিব ?

ইতিহাস সাক্ষ্য দিবে, তিনি পারিয়াছিলেন···নবীন তুরস্ক তাহার প্রমাণ।

ইরাক

সূচনা

গত মহাযুদ্ধে জগতের ভূগোলের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া যায়। রাজ্য ভাঙ্গা-গড়া ছাড়া, বহু দেশের শাসন-তন্ত্র আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়···এবং শুধু যে তাহাদের শাসন-তন্ত্র ও চেহারা বদলাইল, তাহা নয়, তাহাদের অনেকের নাম পর্য্যন্ত বদলাইয়া গেল! একদা মানব-ইতিহাসে যে-ভূমিখণ্ডের নাম ছিল, মেসোপটেমিয়া, আজ জগতে তাহাই ইরাক নামে পরিচিত।

জগতের আদিমতম সভ্যতার সঙ্গে এখানকার মাটী স্তরে স্তরে বিজড়িত। যেদিন য়ুরোপের অস্তিত্ব ছিল না, সেদিন তাইগ্রিস আর ইউফ্রেতিসের মধ্যবর্ত্তী এই ভূমি-খণ্ডে বিরাট বিরাট সব সভ্যতার পতন ও অভ্যুদয় হইয়া গিয়াছে। এই ইরাকেই ছিল, জগতের অন্যতম আদিম সভ্যতার ব্যাবিলোন··· এই মাটীতেই জন্মগ্রহণ করে, উর্ সভ্যতা···এইখানেই রাজ্য করিয়া গিয়াছে, প্রাচীন চালডিয়ানরা। ইরাকের মাটীর তলায়

স্তরে স্তরে সেই সব বিরাট সভ্যতার স্মৃতি ঘুমাইয়া আছে। প্রাচীন মিশর ও প্রাচীন ভারতবর্ষের সভ্যতার সহযাত্রী !

আবার বহু যুগ-যুগান্তর পরে, জগতের আদিমতম মাটীতে আবার নূতন করিয়া ভারতে, মিশরে এবং ইরাকে এক এক নূতন সভ্যতা জাগিয়া উঠিয়াছে। তবে সেদিন ইরাক এবং মিশরের মাটীতে যে-সভ্যতা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহা শুধু আজ স্মৃতি ! ভারতে এখনও সে অতীতের মহিমা জন্মসূত্রে আপনাকে জিয়াইয়া রাখিয়াছে।

ব্যাবিলোনের পতনের পর, মেসোপটেমিয়া বহুকাল ধরিয়া বিস্মৃতির তলদেশে তলাইয়া যায়। তারপর খলিফাদের আমলে আবার সহস্র দীপ জ্বালিয়া সে জাগিয়া উঠে। আজও এই দুই নদীর তীরবর্ত্তী ভূমির আকাশে হারুণ-অল-রশীদের নাম ঘুরিয়া ফিরিতেছে। আজও বোগ্‌দাদ জগতের অমর-নগরীদের অবিনাশী মহিমায় মানবচিত্তে অপরিবর্ত্তনীয় হইয়া বিরাজ করিতেছে।

গত দুই যুগের মধ্যে এই ইরাকে যে রাষ্ট্রীয় আলোড়ন হইয়া গিয়াছে, তাহার উত্থানপতনের বেগ যেমন আকস্মিক, তেমনি দ্রুত। এই অল্প সময়ের মধ্যে য়ুরোপে দুইটী বিভিন্ন জাতি পর পর ইহার উপর আধিপত্য করিয়া গিয়াছে, তিনজন রাজা সিংহাসনে বসিয়াছেন, আবার সিংহাসন হইতে নামিয়া চলিয়া গিয়াছেন, গত উনিশ বৎসরের মধ্যে চব্বিশবার তাহার মন্ত্রি-সভা ভাঙ্গিয়াছে এবং গড়িয়াছে।

মন্ত্রি-সভা ভাঙ্গা আর গড়ার ব্যাপারে ফ্রান্সের মত আর কোন রাষ্ট্র নাই···তাহার কোন মন্ত্রি-সভা কতদিন স্থায়ী হইবে, তাহা কেহই নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারে না। কিন্তু গত উনিশ বৎসরের ইরাক সেদিকে ফ্রান্সকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে !

বিদেশীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা

ভূগোলের দিক থেকে বর্ত্তমান ইরাকের আয়তন হইল, ১১৬,০০০ বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা হইল, প্রায় ৩৫ লক্ষ। বর্ত্তমানে বোগ্‌দাদ শহর হইল ইহার রাজধানী।

রাজনীতিক দিক হইতে এই রাজ্য, তখন তাহার নাম ছিল মেসোপটেমিয়া, তুরস্কের শাসন-অধীন ছিল। যখন ইংলণ্ড হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নাম লইয়া এক বণিকদল ভারতে বাণিজ্য করিতে আসিতেছিল, ঠিক সেই সময় মেসোপটেমিয়াতেও য়ুরোপীয় জাতিদের প্রতিনিধি ধীরে ধীরে বণিকের বেশে প্রবেশ করিতে থাকে।

পারস্য-উপসাগরের ধারে মেসোপটেমিয়ার বিভিন্ন বন্দরে সপ্তদশ শতাব্দীর সূচনা হইতেই, য়ুরোপ হইতে ইংরাজ, ডাচ এবং পর্ত্তুগীজ বণিকের দল নিজের নিজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় ঘোরতর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মাতিয়া উঠে। প্রায় দেড়শো বৎসর ধরিয়া এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাড়িতে বাড়িতে জাতীয় কলহের আকার ধারণ করিতে থাকে।

এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে আমরা দেখিতে পাই যে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংরাজরা অন্য য়ুরোপীয় জাতিদের হটাইয়া নিজেদের প্রাধান্য বেশ সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া লইয়াছে। দূর য়ুরোপের এক-প্রান্তে বসিয়া তুরস্ক তাহার ক্রমশ দুর্ব্বলায়মান হস্ত এতদূর পর্য্যন্ত আর বিস্তৃত করিতে পারিতেছিল না।

ডাচ এবং পর্ত্তুগীজরা প্রথম অবস্থায় ইংরাজের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দেখা দেয়, কিন্তু টিকিয়া থাকিতে না পারিয়া তাহারা সরিয়া যায়। কিন্তু ফ্রান্স আসিয়া, ভারতে যেমন, পারস্য উপসাগরের তীরেও তেমনি ইংরাজের প্রবলতর প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দেখা দিল।

জার্ম্মানী তাহাদের বহু পরে আসে। কিন্তু তুরস্ক গভর্ণমেণ্টকে হাত করিয়া জার্ম্মানী অতি দ্রুত তাহার প্রভাব কায়েমী করিয়া তোলে। বোগদাদ হইতে বার্লিন পর্য্যন্ত রেললাইন বসাইবার প্রস্তাব জার্ম্মানী উপস্থিত করিল, এবং আজ অত্যন্ত আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হয় যে, ইংরাজ সেদিন জার্ম্মানীর এই স্পষ্ট আত্ম-প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে বাধা দেয় নাই!

ইংরাজ সেদিন সকলের চেয়ে ভয় করিত, রাশিয়ানকে। মধ্যপ্রাচ্যদেশে, সেদিন ইংরাজ মনে করিত, রাশিয়ানকে প্রতিহত করাই য়ুরোপীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে তাহাদের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। তাই মেসোপটেমিয়াতে জার্ম্মানীকে এইভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে দেখিয়া ইংলণ্ড বিশেষ কোন প্রতিবাদ জানায় নাই।

কিন্তু গত মহাযুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই বোঝা গেল, কেন য়ুরোপীয় জাতিরা এইখানে একটা প্রতিষ্ঠা-কেন্দ্র গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিল। সামরিক কৌশলের দিক হইতে, ভারতবর্ষের সহিত ইংলণ্ডের সম্পর্ককে আঘাত করিবার পক্ষে মেসোপটেমিয়া হইল, অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সন্ধিস্থল।

• যেদিন ভারতবর্ষের দিকে একচক্ষু রাখিয়া নেপোলিয়ান মিশর পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন, সেদিন তাঁহার আর একচক্ষু এই মেসোপটেমিয়ার উপরই ছিল। জার্ম্মানীর বোগদাদ-বার্লিন রেল-পথ তৈয়ারী করার মূলেও ছিল, সেই এক উদ্দেশ্য। তাই যখন গত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের সূচনা হইল, তখন য়ুরোপে ফ্রান্সের সীমান্ত দেশে যেমন যুদ্ধ তীব্র ভাবে দেখা দিল, তেমনি এই ভূমি-খণ্ডেও ভয়াবহ যুদ্ধাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল।

বিংশ-শতাব্দীর ইতিহাসে সহসা মেসোপটেমিয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, কিন্তু এই দেশের সম্পদের মধ্যে ছিল, কেবল মরুভূ-খর্জ্জুর···তাহার লোভে ইংলণ্ড, জার্ম্মানী, ফ্রান্স, ইতালী নিজেদের দেশ ছাড়িয়া সেখানকার সমরাঙ্গণে মরিতে আসিত না।

ইরাকের মধ্যে মোসলে ডেনের খনি আছে সত্য, কিন্তু সে খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে মাত্র সেদিন···এবং গত দুই যুগের য়ুরোপীয় রাজনীতির ইতিহাস তলাইয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, ইরাক গ্রাস করিবার জন্য যে য়ুরোপীয় জাতিরা ছুটিয়াছিল, তাহা তাহার তেলের জন্য নয়।

তাই মহাযুদ্ধের ঠিক আগে, ইংলণ্ড যখন দেখিল যে, জার্ম্মানী বোগদাদ হইতে রেল-লাইন বস্‌রা পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছে, তখন তাহারা প্রতিবাদ জানাইল। ইংলণ্ডের বিনা-অনুমতিতে বস্‌রা ছাড়াইয়া আর সে লাইন যাইবে না।

ইংলণ্ড যেমন মেসোপটেমিয়াতে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, ফ্রান্স তেমনি সিরিয়াতে তাহার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। মহাযুদ্ধে তাই এশিয়ার এই দেশটীকে লইয়া তুমুল যুদ্ধ বাঁধিয়া গেল। মহাযুদ্ধের শেষে তুরস্কের আধিপত্য এই সব দেশ হইতে চলিয়া গেল···সমস্ত এশিয়া-মাইনর বিজয়ী জাতিদের নির্দ্দেশে অন্যভাবে বিভক্ত হইয়া গেল। মেসোপটেমিয়ার নাম হইল ইরাক ; এবং ইংরাজের কর্ত্তৃত্বাধীনে এই দেশ লীগ অফ নেশন্‌স-এর পরিচালনার অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল।

মহাযুদ্ধের মধ্যে সমগ্র এশিয়া-মাইনরে, আরবজাতিদের মধ্যে এক নূতন জাতীয় আন্দোলন দেখা দেয়। তুরস্কের শাসন হইতে নিজেদের মুক্ত করিয়া আরবেরা নিজেদের স্বাধীনতা জগতে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রকাশ্য আন্দোলন সুরু করিল। ইংরাজ এই আন্দোলনের সুযোগ গ্রহণ করিয়া জার্ম্মানী এবং তুরস্কের বিরুদ্ধে আরবীদের পূর্ণ সহানুভূতি এবং সাহায্য পাইল। তাহার ফলে জার্ম্মানী এবং তুরস্ককে বিতাড়িত করিয়া ইংলণ্ড মেসোপটেমিয়া দখল করিয়া লইল।

কিন্তু আরবরা ইংলণ্ডকে সাহায্য করিয়াছিল, তুরস্ক বা জার্ম্মানীকে সরাইয়া ইংলণ্ডের ক্রীতদাস হইবার জন্য নয়, সমগ্র

পৃথিবীর মধ্যে যে নব-চেতনা জাগিয়া উঠিয়াছিল, মরুবাসী তাহাদের চিত্তে ও তাহা স্পর্শ কবিয়াছিল। তাই ১৯১৭ সালের ১৭ই মার্চ্চ, বিজয়ী ইংরাজ সৈন্যের অধিনায়ক-রূপে যখন জেনারেল মড বোগ্‌দাদ শহরে প্রবেশ করিলেন, তখন তিনি ঘোষণা করিলেন—"আমাদের সৈন্য তোমাদের নগরে বিজয়ী হইয়া প্রবেশ করে নাই, তাহারা আসিয়াছে, তোমাদের মুক্তিদাতা হইয়া।"

সুতরাং সেইদিন হইতে বৃটীশ রাজনীতিতে ইরাক এক অতি প্রয়োজনীয় স্থান অধিকার করিল।

পূর্ব্ব ভূমধ্যসাগর এবং ভারতের মধ্যে ইংলণ্ডে গতায়াতের পথ বলিয়া ইংলণ্ড কোন মতেই ইরাককে তাহাদের কর্ত্তৃত্বাধীন হইতে সরিয়া যাইতে দিতে পারে না···অথচ ইরাকের মুক্তির শর্ত্ত-ও একদা ইরাকবাসীরা ইংলণ্ডের নিকট হইতে পাইয়াছে। ইরাকবাসী আরবগণ বহুদিন পরে স্বাধীনতার স্বাদ পাইয়া, তাহার পূর্ণ অধিকার লাভের জন্য লালায়িত হইয়া উঠিল।

গত মহাযুদ্ধের সময় ইরাক ইংরাজ সামরিক-শাসনের অধীনে থাকে। ক্রমশঃ আরবগণের মধ্যে সন্দেহ জাগিয়া উঠিল যে, ইরাক বোধ হয় তুরস্কের শাসন হইতে ইংলণ্ডের শাসনাধীনে হস্তান্তরিত হইল মাত্র।

১৯২০ সালে যখন লীগ অফ নেশন্‌স ঘোষণা করিল যে, ইরাক ইংলণ্ডের পরিচালনায় ম্যান্‌ডেটরী ষ্টেট হইয়া থাকিবে, তখন জাতীয়তাবাদী দল মাথা তুলিয়া লীগের এই

অনুশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। ১৯২২ সালে ইংলণ্ড আমীর ফয়সলকে ইরাকের সিংহাসনে বসাইলেন।

আমীর ফয়সল ছিলেন, মক্কার শাসনকর্ত্তা রাজা হুসেনের পুত্র। তিনি সিরিয়া হইতে বিতাড়িত হইয়া একরকম নির্ব্বাসিত জীবন যাপন করিতেছিলেন। রাজা ফয়সলের সিংহাসন আরোহণে কিন্তু আরব জাতীয় আন্দোলন কিছুমাত্র প্রশমিত হইল না। তখন ১৯২৪ সালে রাজ-তন্ত্রের অধীন এক শাসন-পরিষদ গঠন করা হইল। ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টের গঠন অনুযায়ী এই শাসন-পরিষদকে দুই ভাগে ভাগ করা হইল, সিনেট এবং লোয়ার হাউস। সিনেটে রাজার মনোনীত ২০ জন সভ্য হইলেন এবং লোয়ার হাউসে সাধারণের নির্ব্বাচিত ১৫০ জন প্রতিনিধির আসন নির্দ্দিষ্ট হইল।

কিন্তু যাহাতে এই শাসন-পরিষদ প্রকৃত জাতীয় প্রতিষ্ঠান হয় এবং দেশের প্রকৃত শাসন-ব্যাপারের সমগ্র দায়িত্ব পায়, তাহার জন্য জাতীয় আন্দোলন সমান ভাবেই চলিতেছিল। তাহার ফলে সেই দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত অনবরত মন্ত্রি-সভা ভাঙ্গিয়াছে এবং গড়িয়াছে। এই নিয়মতান্ত্রিক শাসন-পদ্ধতির আন্দোলনের মধ্য দিয়া ইরাক অচিরকালের মধ্যে তাহার স্বাধীনতা অর্জ্জন করে।

১৯৩০ সালে প্রথম ফয়সল পরলোক গমন করিলেন। তাঁহার শূন্য সিংহাসনে তাঁহার পুত্র গাজী রাজা হইয়া বসিলেন। এই ঘটনার তিন বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ড ইরাকের পূর্ণ স্বাধীনতা

স্বীকার করে, কিন্তু লীগের শর্ত্ত-অনুযায়ী তখনও ইরাকের উপর লীগের ম্যান্‌ডেট্ বলবৎ ছিল। তাহার চার বৎসরের মধ্যে লীগ ইরাক সম্বন্ধে তাহার সমস্ত দায়িত্ব তুলিয়া লয় এবং ১৯৩২ সালের অক্টোবর মাসে ইরাক স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে লীগ অফ নেশন্‌স-এ আসন গ্রহণ করে।

ইরাক আজ স্বাধীন, কিন্তু গ্রেট বৃটেনের সহিত বিশেষ চুক্তিতে সে বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ। এই চুক্তির ফলে ইরাকে ইংরাজ সেনা-বাহিনী স্বতন্ত্র ভাবে থাকিবার অধিকার পাইয়াছে। ইরাকের পুলিশ-বাহিনীর ইন্‌স্‌পেক্টরগণ ইংরাজ এবং ইংলণ্ডের রয়েল এয়ার ফোর্সের ঘাঁটী রাখিবার অনুমোদন ইরাক গভর্ণ-মেণ্টকে স্বীকার করিতে হইয়াছে। এই ভাবে ইংরাজের সহিত মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ ইরাক এই অতি অল্প সময়ের মধ্যে স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়া লইয়াছে।

আভ্যন্তরিক দলাদলি

আজ মাত্র তিন বৎসর হইল রাজা গাজী সহসা এক দুর্ঘটনায় প্রাণত্যাগ করেন। তখন তাঁহার শিশুপুত্রের বয়স মাত্র চার বৎসর ছিল। এই শিশুই দ্বিতীয় ফয়সল নাম লইয়া আজ ইরাকের সিংহাসনে বসিয়া আছেন।

কিন্তু ইরাকের আভ্যন্তরিক রাজনীতিতে দলাদলি গত কয়েক বৎসর অতি কুৎসিৎ আকার ধারণ করে। প্রত্যেক

দলের নেতা স্ব স্ব প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য এমন কি হত্যারও আশ্রয় লইতে কুণ্ঠিত হন নাই।

ইরাকে রাজ্যশাসনক্ষম শিক্ষিত লোকের সংখ্যা খুবই কম। হাতে গুণিয়া তাঁহাদের সংখ্যা ৩০ কি ৪০ বলা যাইতে পারে। গত দুই যুগ ধরিয়া এই কয়জন লোক নানাভাবে ঘুরিয়া ফিরিয়া দলবদ্ধ হয় এবং মন্ত্রিসভা গঠন করেন। তাই দেখা যায় যে এক একজন তিনবার চারবার করিয়া মন্ত্রী হইয়াছেন।

ইরাকের বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী হইতেছেন, নুরী এস্‌ সৈয়দ পাশা। ১৯৩৬ সালে হিকমৎ সুলেমান সহসা সৈন্যদল লইয়া সবলে মন্ত্রিসভা দখল করিয়া লন এবং নুরী পাশা নির্ব্বাসনে চলিয়া যান। এই অভ্যুত্থানে তাঁহার প্রধান সহায় ছিলেন, বকীর সিদকী।

নুরী পাশা দেশত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার পর সহসা বকীর সিদকী গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত হন এবং হিকমৎ সুলেমান মন্ত্রি-সভা ভাঙ্গিয়া দেন। সেই সময় নুরী পাশা আবার ইরাকে প্রবেশ করেন এবং সেইদিন হইতে তিনিই ইরাকের প্রধান মন্ত্রী হইয়া আছেন।

বর্ত্তমান যুদ্ধে ইরাক জার্ম্মানীর সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া ১৯৩৯ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর যুদ্ধে যোগদান করে।

নবীন আরব

প্রস্তাবনা

আরবের নাম শুনিলেই, সহসা তাহারই সঙ্গে প্রতিধ্বনির মত জাগিয়া উঠে, মরু-ভূমি। এবং সেই সঙ্গে কল্পনার পট-ভূমিতে মনশ্চক্ষে যে ছবি ফুটিয়া উঠে, তাহা রবীন্দ্রনাথ অমর করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন—

"ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব-বেদঈন
চরণ-তলে বিশাল-মরু দিগন্তে বিলীন···"

আরব-ভূমি মানচিত্রের বাহিরে দেখি নাই, কিন্তু যদি কেহ আমাকে সেই আরব-ভূমির ছবি আঁকিতে বলে, তাহা হইলে ভ্যান্‌লুনের পদ্ধতি-অনুসারে আঁকিব···অসমাপ্ত রেখায় সীমাহীন শূন্যভূমি···তাহার মধ্যে ইতস্তত দু'একটী খেজুরগাছ, আকাশে এক ফালি কাস্তের মত চাঁদ এবং দিক্-চক্রবাল-রেখায় চাঁদের সঙ্গে মিতালী করিবার জন্য উঠিয়াছে, দীর্ঘ একটী মিনার।

এই রেখাচিত্রকে সরাইয়া যদি কোন চিত্রকর পাহাড়-পর্ব্বত, নদ-নদী সমস্ত দিয়া আরবের মানচিত্র আঁকেন, আমার মনে হয়, এই রেখাচিত্রই সমধিক ভাবে আসল আরবকে ফুটাইয়া তুলিবে।

বর্ত্তমান জগতের মানসিক গঠনের দিক হইতে বিচার করিলে, আরবের বিষয় আলোচনা করিতে হইলে, সে, আলোচনার প্রথমেই এক বিরাট প্রশ্ন মাথা তুলিয়া উঠে···সে প্রশ্ন হইল, আরব-ভূমি বলিতে কাহাকে বোঝায় ?

বর্ত্তমান ঐতিহাসিক এই প্রশ্নেব দুইটী উত্তর দিয়াছেন।

প্রথম উত্তর হইল,

এশিয়ার মানচিত্রে পশ্চিম অংশে, একদিকে লোহিত সমুদ্র, অপর দিকে পারস্য উপসাগর, নিম্নে ভারত মহাসাগর, এই তিন দিকে জলবেষ্টিত এবং উর্দ্ধে ভূমধ্যসাগরের তীরাংশ এবং তুরস্কের দক্ষিণ সীমান্ত—এই বর্ণনাবেষ্টিত অংশ হইল আরব-ভূমি। ইহার মধ্যে যে যে প্রধান দেশ পড়ে, তাহারা হইল, ইরাক, সিরিয়া-লিবেনন, প্যালেষ্টাইন, ট্রান্‌স্‌জর্ডন, সউদী আরব, ইয়েমেন এবং ওমান।

দ্বিতীয় উত্তর হইল,

ভৌগোলিক সীমানির্দ্দেশের বাহিরে, যেখানে যেখানে আরববাসীরা বাস করেন এবং ধর্ম্ম-কর্ম্ম, ভাষা-ভাবনা সূত্রে যাঁহারা আজও ভৌগোলিক মরু-আরবের সহিত আত্মিক যোগে অবিচ্ছিন্ন। এই উত্তর-অনুসারে তাহার মধ্যে পড়ে, আগেকার

প্রদেশগুলি ছাড়া, মিসর, লিবিয়া, টিউনিশিয়া, আল্‌জিরিয়া এবং মরক্কো। এশিয়া এবং আফ্রিকা এই দুই মহাদেশ জুড়িয়া আরবভূমি। আয়তনে প্রায় দুইটি ভারতবর্ষের সমান, অথবা প্রায় ষাটটী ইংলণ্ডের সমান।

ইতিহাসের দিক হইতে একদা এই বিরাটভূমি সমস্তই আরব-সাম্রাজ্য—ইহার বাহিরেও অন্য বিভিন্ন ভাষাভাষীর দেশেও বিস্তৃত ছিল। আজ আরব-সাম্রাজ্য বলিতে কিছুই বোঝায় না। একমাত্র সউদী আরব, আরব-সাম্রাজ্যের সেই অস্তগত মহিমার কিঞ্চিৎ স্মৃতি এই বিংশ শতাব্দীর নব-জাগরণের যুগে জাগাইয়া তুলিয়াছে।

নব-জাগ্রত আরব-জাতীয়তা সেই চেতনাকে কেন্দ্র করিয়া এই নূতন দিনের আলোয় নিজের নূতন আত্মপ্রসারের কি নব-পরিকল্পনা করিতেছে, রাজনীতির দিক হইতে তাহাই হইল আরবের বর্ত্তমান জাতীয় আন্দোলনের লক্ষণীয় বিষয়।

ইংরেজী সাহিত্যে বিখ্যাত রিপ্ ভ্যান্ উইন্‌ক্‌ল্-এর মত আরব তাহার জীবনের মধ্যদিনে একেবারে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। আপনার মরুনির্জনতার মধ্যে সুদীর্ঘ দিন সে ঘুমাইয়া ছিল। মানব-সভ্যতার প্রথম দিনে, তাহারই বুকে জগতের দুইটী শ্রেষ্ঠ আদিম সভ্যতা জাগিয়াছিল, ব্যাবিলোন এবং আসিরিয়ার সভ্যতা। কিন্তু নিশ্চিহ্ন হইয়া মরু-বালুকার মধ্যে সে সভ্যতার ধারা বিলুপ্ত হইয়া যায়।

নব জাগরণ

ইতিহাসের জাগর দিনে প্রাচীন আরব অতীতের ভগ্ন রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান এবং সভ্যতার ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন জীবন-যাত্রা লইয়া অর্দ্ধ-বর্ব্বরতায় মধ্যে ডুবিয়াছিল ...মরুভূমির তপ্ত-বায়ু, শস্যহীন অনুদার-ভূমি তাহাকে দস্যু করিয়া তুলিয়াছিল...ঐতিহ্য-হীন তাহার আত্মিক-জীবন অযত্ন-বর্দ্ধিত বন্য-শস্পের ন্যায় কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছিল...সেই সময়..সেই মরুভূমির মধ্য হইতে এক দিব্য পুরুষ জন্মগ্রহণ করিলেন, যিনি মরুর মার্ত্তণ্ড তেজকে মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিয়া নূতন আরব এবং নূতন মানুষের সৃষ্টি করিয়া গেলেন। সেই দিন হইতে মরু-আরব এক অপরূপ মহিমা লইয়া মানব-সভ্যতার ইতিহাসে প্রবেশ করিল।

৬২২ খৃষ্টাব্দে মদিনায় হজরৎ মোহাম্মদ যে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের সৃজন করেন, তাঁহার তিরোধনের মাত্র আশী বৎসরের মধ্যে তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া, সেই ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের সীমা সুদূর অতলান্তিকের তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। সে ইতিহাস শুধু রাজ্য-জয়ের ইতিহাস নয়। আরবের সেই-সময়কার ইতিহাস মানব-সভ্যতার ইতিহাস।

জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, নগর-গঠনে, লোক-শাসনে, কাব্যে, সাহিত্যে, ধর্ম্মচিন্তায়, সেই-সময়কার আরব-মনীষিগণ য়ুরোপ এবং এশিয়ার মধ্যস্থলে থাকিয়া এই দুই মহাদেশের, এই দুই মহাভাবধারার মিলন ও সমন্বয় ঘটাইয়াছিলেন; এবং সেই মিলন ও সমন্বয় হইতে এক নূতন ভাব-ধারা ও বিজ্ঞানের সৃষ্টি তাঁহারা করিয়া গিয়াছিলেন, যাহা আজও মানব-সভ্যতার দেহে রক্ত-কণিকার মত প্রবহমান রহিয়াছে।

তারপর সেই প্রতিভার অত্যুচ্চ শিখর হইতে আরব ক্রমশঃ ঘুমাইয়া পড়ে। তাহার রাজ্য চলিয়া যায়, মরু-বালুকার গর্ভে। এবং তুরস্কের শাসনাধীনে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত আরব আত্মবিস্মৃত হইয়া ঘুমাইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে গত মহাযুদ্ধের পর হইতে সে জাগিয়া উঠিয়াছে মাত্র।

জাগিয়া উঠিয়া আরব দেখিল, তাহার আশে-পাশে চারিদিকে য়ুরোপ তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। য়ুরোপ যে শুধু বাহিরের দিক হইতে তাহার দেহকে আক্রমণ করিয়াছে, তাহা নয়, তাহার মনের রাজ্যেও য়ুরোপ আক্রমণ চালাইয়াছে। আরব-জাতীয়তা তাই আজ এশিয়ায় এক মহাপ্রশ্নের সম্মুখীন হইয়াছে, দেহ ও মনের দিক হইতে আজ য়ুরোপের সঙ্গে তাহার কি সম্বন্ধ হইবে।

বাহিরের রাষ্ট্রীয় দিক হইতে গত মহাযুদ্ধের পর, আরব দেখিল, তাহার সর্ব্ব-অঙ্গ টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া গিয়াছে এবং

এক একটী টুক্‌রা য়ুরোপের এক একটী জাতি নানা অছিলায় অধিকার করিয়া বসিয়া আছে।

আভ্যন্তরীণ আন্দোলন

মিসর-সম্বন্ধে আলোচনা এই পুস্তকের অন্যত্র করা হইয়াছে। সুতরাং মিসরের রাজনৈতিক জাগরণ সম্বন্ধে এখানে আর আলোচনা করা হইল না। আজ মিসর স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে ইংলণ্ড কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে, তবে কয়েকটী শর্ত্তে, ইংলণ্ডের সহিত সে বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ থাকিবার যুক্তি দিয়া তাহার স্বাধীনতা ফিরিয়া পাইয়াছে। ইরাক সম্পর্কেও এই পুস্তকের অন্যত্র আলোচনা করা হইয়াছে। মিসরের ন্যায় ইরাকও ইংলণ্ডের সহিত বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ স্বাধীন রাষ্ট্র।

প্যালেষ্টাইনের উত্তরে এবং ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্ব তীরে হইল, সিরিয়া প্রদেশ। সমগ্র আরবভূমির ন্যায় একদা সিরিয়াও তুরস্কের শাসনাধীন ছিল। গত মহাযুদ্ধের শেষে সিরিয়া ফরাসী অনুশাসনের অন্তর্ভুক্ত হয়। গত মহাযুদ্ধে হেজাজের শাসনকর্ত্তা আমীর হুসেন মিত্রপক্ষকে প্রভূত সাহায্য করেন। যুদ্ধের পরে সিরিয়াতে ১৯২০ সালে এক বিশেষ কংগ্রেসের অধিবেশন হয়।

সেই সভায় আমীর হুসেনের পুত্র আমীর ফয়সলকে সিরিয়ার রাজা বলিয়া ঘোষণা করা হয়। কিন্তু কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্ত মিত্রপক্ষের জাতিরা গ্রহণ করিতে অসম্মত হন এবং তাহার ফলে হুসেনকে সিরিয়া হইতে সরাইয়া ইরাকের শাসনকর্ত্তা করিয়া দেওয়া হয়। লীগ অফ নেশন্‌স্‌-এর নির্দ্দেশ-অনুযায়ী সিরিয়া ফরাসী-শাসনের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়।

কিন্তু সমগ্র আরবে যে জাতীয়তা-আন্দোলন মাথা তুলিয়া উঠিয়াছে, সিরিয়াতেও তাহা প্রকট হইয়া উঠে। ১৯২০ হইতে এই আন্দোলন সুরু হয় এবং ফরাসী সরকারের সমস্ত প্রতিবন্ধকতা-সত্ত্বেও প্রতি বৎসর এই আন্দোলন তীব্রতর হইয়া উঠিতে থাকে। অবশেষে ১৯৩৬ সালে ফরাসী গভর্ণমেণ্ট সিরিয়াকে স্বাধীনতা দিবার প্রতিশ্রুতি দেন।

সিরিয়ার সহিত ফরাসী সরকারের যে নূতন চুক্তি হয়, তাহার ফলে ফরাসী সরকার স্বীকার করেন যে, সেই চুক্তির তিন বৎসর পরে সিরিয়া নিজেকে পূর্ণভাবে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিতে পারিবে। কিন্তু বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ আসিয়া পড়ায়, ফরাসী গভর্ণমেণ্ট চুক্তির সে-অংশ স্বীকার করিতে পারেন নাই। সিরিয়ার ভাগ্য আবার এই মহাযুদ্ধের সঙ্গে জড়াইয়া গিয়াছে।

প্যালেষ্টাইনকে লইয়া মহাযুদ্ধের পর যে অপূর্ব্ব রাজ-নৈতিক সমস্যার সৃষ্টি হয়, এই যুদ্ধে তাহা চাপা পড়িয়া গিয়াছে মাত্র, তাহার মীমাংসা এখনও হয় নাই এবং সে-

সমস্যার মীমাংসা না হইলে আরব-ভূখণ্ডে শান্তির সম্ভাবনা নাই।

প্যালেষ্টাইনের সমস্যার সঙ্গে আরবের অন্য প্রদেশের সমস্যার একটা প্রধান পার্থক্য হইতেছে যে, এই দেশের মাটীতে, আরবের সঙ্গে সঙ্গে য়িহুদীরাও নিজেদের জন্মস্বত্ব দাবী করিতেছে। এবং গত দুই যুগ ধরিয়া প্যালেষ্টাইনে আরব ও য়িহুদী সংঘর্ষে বহুবার মেদিনী রক্তরঞ্জিত হইয়াছে।

প্যালেষ্টাইনের মোট জনসংখ্যা হইল, ১৪৮০,০০০—তাহার মধ্যে আরবদের সংখ্যা হইল, ১০০০,০০০ এবং য়িহুদীদের সংখ্যা হইল মাত্র ৪৮০,০০০। প্যালেষ্টাইনের এই আরব-ইহুদী সমস্যা গত মহাযুদ্ধেরই সৃষ্টি। প্রাকৃতিক নিয়মে এই সংঘর্ষ এত প্রকট হইয়া উঠে নাই, মানুষের বুদ্ধির উত্তাপে এই সমস্যার কণ্টক-তরু মরুপ্রান্তে গজাইয়া উঠিয়াছে।

গত মহাযুদ্ধের শেষাশেষি, ১৯১৭ সালের ২রা নভেম্বর, তদানীন্তন বৃটীশ পররাষ্ট্রসচিব লর্ড জে, এ, ব্যালফোর নিখিল য়িহুদী-সঙ্ঘের সেক্রেটারী লর্ড রথচাইল্‌ড্‌কে একখানি পত্র লেখেন। এই ঐতিহাসিক পত্রখানিই প্যালেষ্টাইনের বর্ত্তমান সমস্যার মূলে। এই পত্রে লর্ড ব্যালফোর, বৃটীশ রাজ-সরকারের তরফ হইতে য়িহুদীদের আশ্বাস দেন যে, প্যালেষ্টাইনকে তাঁহারা য়িহুদীদের জাতীয় ভবনে পরিণত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। এই আশ্বাস-অনুযায়ী গত মহাযুদ্ধের শেষে প্যালেষ্টাইনে বাহির হইতে

য়িহুদীদের আনাইয়া বসবাস স্থাপন করানো নিয়মিত ভাবে চলিতে থাকে।

এধারে ব্যালফোর ঘোষণার আগে ১৯১৫ সালে ইংরাজ সেনাপতি ম্যাকমোহান ইংরাজ রাজসরকারের তরফ হইতে আরবদের আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, যুদ্ধে ইংরাজদের পক্ষ অবলম্বন করার দরুন, যুদ্ধের শেষে যে নিখিল-আরব-রাষ্ট্র গঠিত হইবে। তাহার আয়তনের যে বর্ণনা তখন দেওয়া হয়, তাহাতে প্যালেষ্টাইনও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এই দুই পরস্পর বিরোধী আশ্বাস-বাণীর ফলে, প্যালেষ্টাইনে আরব-জাতিয়তা-আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করিয়া য়িহুদীদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণে জাগিয়া উঠিল।

এধারে ব্যালফোর ঘোষণা-অনুযায়ী আন্তর্জাতিক য়িহুদী-প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে প্রত্যেক বৎসরে প্যালেষ্টাইনে বাহির হইতে য়িহুদীদের আনাইয়া জমি-জমা দিয়া বসানো হইতে লাগিল। ফলে, এমন অবস্থা দাঁড়াইল যে, আরববাসীরা দেখিল, তাহাদের সম্মুখে এমন দিন আসিতেছে, যেদিন তাহাদের নিজেদের দেশে তাহাদের ভূমিহীন হইয়া থাকিতে হইবে।

এই সমস্যার আংশিক সমাধানরূপে বৃটীশ পার্লামেণ্ট প্যালেষ্টাইনের অঙ্গ থেকে ট্রান্স্-ডাউন প্রদেশ আরবদের জন্য আলাদা করিয়া দিলেন এবং আমীর আবদুল্লাহ্‌কে সেই নব-সৃজিত প্রদেশের শাসক নিযুক্ত করা হইল। কিন্তু আরব-য়িহুদী-সংঘর্ষ তাহাতেও থামিল না।

১৯২১ সালে এবং ১৯২৯ সালে আবার আরব-য়িহুদীদের মধ্যে সংগ্রাম মারাত্মক আকার ধারণ করিল। কঠোরহস্তে বৃটীশ সৈন্য এই বিপ্লব দমন করিল এবং পার্লামেণ্ট এই সমস্যা-সমাধানের জন্যে এক কমিশন বসাইলেন। এই কমিশন গবেষণা করিয়া সিদ্ধান্ত দিলেন যে, প্যালেষ্টাইনে য়িহুদীদের বার্ষিক আমদানী বন্ধ করিতে হইবে এবং আভ্যন্তরিক শাসনের জন্যে একটী ব্যবস্থা-পরিষদ গঠন করিতে হইবে, যে পরিষদে আরব-সভ্যদের সংখ্যাধিক্য থাকিবে। য়িহুদীরা কমিশনের এই সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানাইল। তাহার ফলে এই সিদ্ধান্তের কথা চাপা পড়িয়া গেল।

বাহিরের দিক হইতে য়িহুদীদের আমদানী কাগজ-কলমে কমিয়া গেলেও, গোপনে বে-আইনী ভাবে সমান ধারায় বাহির হইতে য়িহুদীরা প্যালেষ্টাইনে আসিতে লাগিল—বিশেষ করে তখন হিটলারের দৌরাত্ম্যে জার্ম্মানী এবং য়ুরোপের অন্য সব দেশ হইতে য়িহুদীরা প্রাণ লইয়া পলাইতেছিল। তাহার ফলে আরবরা আবার প্রকাশ্যে য়িহুদীদের বিরুদ্ধে বিপ্লব ঘোষণা করিল এবং অতর্কিত আক্রমণে প্যালেষ্টাইন আবার ক্ষত-বিক্ষত হইয়া উঠিল।

এই সময় লর্ড পীলের অধীন আবার এক কমিশন বসিল। পীল কমিশন স্থির করিল যে, প্যালেষ্টাইনকে দু'ভাগে ভাগ করিয়া ফেলিতে হইবে···যে-সব অঞ্চলে য়িহুদীরা বস-বাস স্থাপন করিয়া ফেলিয়াছে, সেই সব অঞ্চল একত্র করিয়া

একটী য়িহুদী-ষ্টেট গঠিত হইবে···য়িহুদী সমুদ্র-তীরের অঞ্চল-গুলিতেই বসবাস স্থাপন করিয়াছিল · সুতরাং ভিতর-প্যালেষ্টাইনে আরবরা তাহাদের ষ্টেট গড়িয়া তুলিবে, অবশ্য সমুদ্র-পথের জন্য আরবরা জাফার নিকট সমুদ্রের তীরে একফালি জায়গা পাইবে ; আর তা ছাড়া, জেরুজালেম এবং হাইফা বন্দর ইংরেজদের শাসনাধীন থাকিবে।

আরব এবং য়িহুদী দুই পক্ষই পীল-কমিশনের সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করিল। তখন ১৯৩৯ সালের মে মাসে বৃটীশ পার্লামেণ্ট ঘোষণা করিলেন যে, প্যালেষ্টাইনকে য়িহুদীদের জাতীয় ভবনে পরিণত করা সম্পর্কে বৃটীশ পার্লামেণ্টের কোনও পরিকল্পনা নাই। সেই সম্পর্কে আরবরা ম্যাক-মোহনের চিঠির উপর দাবী করিয়া যে আরব ষ্টেটের আন্দোলন সুরু করিয়াছে, তাহাও বৃটীশ পার্লামেণ্ট অগ্রাহ্য করিতেছেন। প্যালেষ্টাইন অতঃপর বৃটীশ-শাসনাধীন থাকিবে এবং শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হইলে পর, পাঁচ বৎসর পরে, এক কমিটি গঠিত হইবে···সেই কমিটী প্যালেষ্টাইনের ভবিষ্যৎ শাসন-পদ্ধতি কি হইবে, তাহা স্থির করিবে।

পার্লামেণ্টের সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বর্ত্তমানে প্যালেষ্টাইন একজন বৃটীশ হাই-কমিশনারের শাসনাধীন। স্যার হ্যারল্ড ম্যাক্‌মাইকেল হইলেন, বর্ত্তমান হাই-কমিশনার।

য়িহুদীরা নূতন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে টেল্-অভিভ নামে একটী নূতন শহর গড়িয়া তুলিয়াছে এবং স্কুল, কলেজ, বিশ্ব-

বিদ্যালয় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করিয়া ইতিমধ্যে এক পূরাপূরি নূতন ধরণের রাষ্ট্রের বনিয়াদ গড়িয়া তুলিয়াছে। মনে হয়, একটা বিরাট সংঘর্ষকে এখানে ধামা-চাপা দিয়া রাখা হইয়াছে মাত্র··· ভবিষ্যতে যে এখান হইতে আবার কি দাবাগ্নি জ্বলিয়া উঠিবে, তাহা কেহই বলতে পারে না।

ইয়েমেন আরবের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত একটী স্বাধীন রাষ্ট্র। এখানে পুরাতন রাজতন্ত্র এখনও প্রতিষ্ঠিত। বর্ত্তমান শাসক হইলেন, ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন্ মোহাম্মদ বিন্ হামিদ্-উদ-দীন্। এখানকার শাসকরা ইমাম উপাধি গ্রহণ করিয়া থাকেন।

ইয়েমেনের মত আরবের পূর্ব্ব-সীমান্তে ওমান-প্রদেশ। ওমানও স্বাধীন রাষ্ট্র কিন্তু বৃটীশের সঙ্গে চুক্তি-অনুযায়ী এখানে একজন করিয়া বৃটীশ এজেণ্ট নিযুক্ত থাকেন মাত্র। বর্ত্তমান শাসকের নাম সুলতান স্যার সৈয়দ বিন তৈমুর।

সউদী আরবের জনক

বর্ত্তমানে আরববাসীর নিকট আরব বলিতে কিন্তু তাহারা বিশেষ করিয়া সউদী আরবকেই জানে। সমগ্র মধ্য আরবকে লইয়া সউদী-আরব। এবং এই সউদী-আরব, যাঁহার নাম হইতে নাম পাইয়াছে, সেই ইবনে সউদ্‌কে সমগ্র আরব বাসীরা তাহাদের নব-জাগ্রত বাসনার প্রতীকরূপে জানে।

আভ্যন্তরিক রেষা-রেষি এবং দলাদলিকে নির্মম-হস্তে চূর্ণ করিয়া ইবনে সউদ মরু-বেদঈনকে একত্র ও সংহত করিয়া যে স্বাধীন রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিয়াছেন, সমগ্র আরব ভাষাভাষী উৎসুক আগ্রহে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। এবং একথা কেহই প্রতিবাদ করিবে না যে, সমগ্র আরব-জগতে ইবনে সউদের মতন ক্ষমতাশালী ব্যক্তিত্ব এবং সেই সঙ্গে চরিত্রবান্ লোক আর দ্বিতীয় নেই।

সউদী আরব ইবনে সউদের সৃষ্টি। যেদিন ইবনে সউদ জন্মগ্রহণ করেন, সেদিন মধ্য-আরব নানা প্রতিদ্বন্দ্বী দলে ছিন্ন-ভিন্ন। তাঁহার পিতা রিয়াদের শাসনকর্ত্তা ছিলেন, কিন্তু তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী শত্রুর হস্তে পরাজিত হইয়া রাজ্যচ্যুত হন এবং মরুর মধ্যে বেদঈনদের শিবিরে শিবিরে আত্মগোপন করিয়া কোন রকমে আত্মরক্ষা করেন। তাঁহার একমাত্র ভরসা ছিল, তাঁহার পুত্র। অতি শৈশবকাল হইতে তিনি ইবনে সউদকে অতি কঠোর ভাবে গড়িয়া তোলেন।

একমাত্র নিজের চেষ্টায় এবং সাহসে ইবনে সউদ একে একে সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিদের পরাজিত করে সমস্ত মধ্য আরবকে এক শাসনের অন্তর্ভুক্ত করেন। মাত্র পঞ্চাশ জন বিশ্বস্ত সহচর লইয়া তিনি তাঁহার দুঃসাহসিক জীবন-যাত্রায় নামেন। এবং অসম্ভব রকম দুঃখ-দৈন্য ও বিপর্য্যয় সহ্য করিয়া আজ তিনি ইসলাম জগতের মধ্যে মরু-আরবের বিলুপ্ত গৌরব আবার সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছেন।

ইসলাম-জগতে কর্ম্মবীর

ইসলাম-জগতে যে তিনজন কর্ম্মবীর বর্ত্তমান যুগে জন্ম-গ্রহণ করেন, কামাল আতাতুর্ক, ইবনে সউদ এবং ভাগ্যহত আমানুল্লাহ—ব্যক্তিত্বের দিক হইতে তিনজনই জগতের শ্রেষ্ঠ কর্ম্মবীরদের মধ্যে গণ্য। কিন্তু এই তিনজনের নীতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কামাল এবং ইবনে সউদ তাঁহাদের জীবনে সফলকাম হয়েছেন, ভাগ্যহত আমানুল্লাহ সেক্ষেত্রে পরাজিত ও লাঞ্ছিত। তিনজনেই চেয়েছিলেন, স্ব স্ব সমাজ ও রাষ্ট্রকে সংস্কার করিতে। আমানুল্লাহ জাতির মনস্তত্ত্বকে অবজ্ঞা করিয়া যে ভুল করিয়াছিলেন, কামাল এবং ইবনে সউদ সে ভুল হইতে নিজেদের দূরে রাখিতে পারিয়াছিলেন। তবে কামাল এবং ইবনে সউদের নীতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

কামাল রাষ্ট্রকে ধর্ম্মের অনুশাসন থেকে দূরে রেখেছিলেন, ইবনে সউদ কোরাণ হাতে করিয়া সউদী-আরব গড়িয়া তুলেন। কামাল বিশ্বাস করেন, আধুনিক বিজ্ঞানকে, ইবনে সউদ সেখানে অবিচল বিশ্বাসে আঁকড়াইয়া আছেন, ধর্ম্মের সনাতন বিধানকে এবং একদা সেই আদর্শে আবার মরু-আরব সমগ্র ইসলাম-জগতে তাহার হারানো আত্মমর্য্যাদাকে ফিরিয়া আনিবে, এই তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস।